

হাসির গোয়েন্দা গল্প



শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্টীট ॥ কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ :

বর্থস্যাত্মা (১১ই জুলাই, ১৯৫৪)

প্রকাশক

অজিত কুমার খান

কিশোর সাহিত্য সংব

৭৩, আমীজী সরণী

কলিকাতা ৮৮

মুদ্রাকর

আশুধীর কুমার দে

বাণীরেখা প্রিটাস

৮৫/১বি/এইচ/৫, মুরারি পুস্তক রোড

কলিকাতা ৫৪

ছবি

অমল চক্রবর্তী

প্রচ্ছন্দ

চাকু খান

এই সঙ্কলনে আঁ।

গোয়েন্দা গোবিধ'ন : শিবরাম চক্রবর্তী
গুণশিল্পের গুণপনা : সৌলা মজুমদার
ওষ্ঠাদে ওষ্ঠাদে : নারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায়
গোবিন্দ গোয়েন্দা : ধীরেন্দ্র লাল ধৰ
গোয়েন্দা দে ও গোয়েন্দা দে : হিমানীশ গোস্বামী
গৰ্জন গোয়েন্দা : তারাপদ রায়
ভাগশপ্তরে গোয়েন্দাগিরি : অসিত গুপ্ত
এক টিপ নস্তি : ঘনোরঞ্জন ঘোষ
লম্বুদার গোয়েন্দাগিরি : পরিচয় গুপ্ত



গোয়েন্দা গোবৰ্ধন
শিবরাম চক্ৰবৰ্তী

নাঃ বিজ্ঞাপনে কাঙ্গ হয় সত্যিই !
হৰ্ষবৰ্ধন এসে ধপ কৰে বলশেন আমাৰ ডেকচেয়াৰে। হঁ।
ছেড়ে বলশেন কথাটা।

‘হঁ। কথাটা যেমন বিজ্ঞাপনসম্মত তেমনি বিজ্ঞানসম্মতও বটে
বিজ্ঞজনেৰ মতই তাঁৰ কথায় আমাৰ সায়।

‘সেদিন আপনাকে দিয়ে আনন্দবাজারে বাব কৰাৰ অন্তে সে’
বিজ্ঞাপনটা লিখিয়ে নিয়ে গেলুম না ?.....’

‘হঁ। মনে আছে আমাৰ।’ আমি বললাগঃ ‘রাতেৰ পাহাৰ
দারেৰ অন্তে সেই ত ?’

‘আমাদেৱ কাঠেৰ কাৰখনায় রোজেৱ বিক্ৰিৰ বছৎ টাকা পঢ়ে
থাকে ক্যাশ বাক্সে, বাড়ি নিয়ে আসা সন্তুষ্ট হয় না, পৱন্দিন সে টাকাৰ
সোজা গিয়ে জমা পড়ে ব্যাক্সে—সেই কাৰণে, রাত্রে টাকাট
অংগলাবাব জন্মই কাৰখনায় থাকবাৰ একজন সুদক্ষ লোক চেছে
ছিলাম আমৰা।.....’

‘রাতেৰ চাৰ প্ৰহৱ পাহাৰ দেবাৰ জন্য সুদক্ষ এক প্ৰহৱী
বেশ মনে আছে আমাৰ।’ আমি বলিঃ ‘আমিই ত লিয়ে
দিলাম কপিটা। তা, কিছু ফল পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা দিয়ে ?’

‘পেয়েছি বইকি ফল। বলতে কি, সেই কথাটা জানাতেই
আপনাৰ কাছে আসা।’

‘ফল বলতে !’ গোবৰ্ধন এসেছিল তাৰ দাদাৰ সঙ্গেঃ ‘ৱীতিমতঃ
প্ৰতিফল পেয়েছি বলা যায়।’

‘কটা সাড়া এলো।’

‘আপাতত একটাই।’ ওর দাদা জানানঃ ‘ক্রমশঃ আরও ড়া পাবো আশা করছি। আপাতত একটাই।’

‘ওই একটাতেই সাড়া পড়ে গেছে।’ সাড়া পাওয়া যায় বরাবরও। ‘সাড়া পড়ে গেছে সারা চেতলায়।’ সে বলে।

‘হ’ইঞ্চি বিজ্ঞাপনের জগ দুশো টাকা। তা নিক তাতে হঁথুই। সে হ’ইঞ্চিরই বা দাম দেয় কে ?’

‘হ’শো টাকার বিজ্ঞাপন দিলে অন্তত তার দুশো গুণ লাভ করছি কারবারে—তা নইলে লোকে দেয় কেন ?’

‘এখানেও বেশ লাভ হয়েছে সোকটার, দুশো গুণেরও ঢের বেশি।’
‘প্রায় দুশো গুণ—তাই না দাদা ?’ হিসেব করে বলে ভাইটি :
‘ট হাজার টাকার মতই ছিল না বাক্সটায় ?’

‘প্রায় আশি হাজার টাকার কাছাকাছি। বিলকুল ফাঁক ?’
‘আশি হাজার টাকা হলে কত হয় ?’ গোবরা আঙুল দিয়ে কাশের গায় পারসেটেজের আঁক কষতে লাগে।

আমার সামান্য বুদ্ধির আঁকশি দিয়ে শুদ্ধের হিসেবের নাগাল ই না—‘বিলকুল ফাঁক ! তার মানে ?’ শুধাই দাদাকে।

‘মানে কাল সকালের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বেঙ্গল না আমাদের ? আর কাল রাত্তিরেক কারখানায় সিঁধ কেটে চোর চুকে সমস্ত টাকা ময়ে সরে পড়েছে। আজ কারখানা খুলতে গিয়ে দেখি ক্যাশ আঞ্চে ভাঙ্গা !’

‘আঠা ?’ আতকে উঠি আমি : ‘তা ধৰে দিয়েছেন পুলিশে ?’
‘পুলিশে ধৰে দিয়ে কী হবে ? আমাদের পাকড়ে নিয়ে টানা যাচড়া করবে থানায়। এখন নিজেদের কারবার দেখব, না থানা-পুলিশ করব ?’ বলেন হর্ষবধনঃ ‘আর চোর যা ধৰবে শৱা তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।’

‘আমি ধৰতে পারি চোর।’ বলল গোবরা : ‘তা দাদা আমায় রাখতেই দিচ্ছে ন।’

‘ইা বললেই হোলো চোর ধরবো । ওদের কাছে হোৱা-ছু
থাকে না ? ধরতে গেলেই ছুরি বসিয়ে দেবে ঘ্যাচাং করে । তুঁ
ফাসিয়ে দেবে এক কথায় । ওর মতন নাবালক একটা ছোড়া
আমি ছুরির মুখে ঠেলে দেব —আপনি বলেন ?’

‘কি করে বলি ?’ বলতে হয় আমায় : ‘ওসব হোৱা-ছু
ব্যাপারে আমাদের বয়স্কদের না থাকাই ভালো ।’

‘আমি কিন্তু অক্ষে ধরে দিতাম । কোনো হোৱা-ছু
মধো না গিয়েও—স্বেফ গোয়েন্দাগিরি করে ।’

‘কি করে ধরতিস ?’

‘ঞ্জ মাটি ধরেই ।

‘ও ! মাটিতে বুঝি পায়ের ঢাপ পড়েছে চোরের ?’ আমি কোই
হলী হই : ‘কারখানার মাটিতে পায়ের দাগ রেখে গেছে চোরের ?’

‘দাগ না ছাই !’ মুখ বিকৃত করেন হর্ষবর্ধন : ‘সিগ্রেটে
ছাইও ফেলে যায়নি একটু । কী নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি শুনি ?’

‘কারখানার মাটি নয়, সেই মাটি । বলে না সে—যে মাটিটে
পড়ে লোকে ওঠে তাই ধরে ? সেই মাটি ধরেই আমি চোর ধরব
ফাস করে গোবরা । ‘বিজ্ঞাপনটা দিয়ে মাটি হয়েছে ত ! ঐ মাটি
দিয়েই আমার কাজ হাসিল করব আমি ।’

ওর রহস্যের আমি থই পাই না । এমন কি ওর দাদাও থ হয়ে
থাকেন ।

‘ইা চোর ধরবে গোবরা !’ বলে তিনি উথলে উঠলেন একটু
পরেই : ‘তাহলে তখন ধরলে না কেন ? এর আগেও ত জিনিস
চুরি গেছল আমাদের ।’

‘এর আগেও গেছে আবাৰ ?’

‘ইা আমিই তো চুরি গেছলাম !’ হর্ষবর্ধন প্রকাশ করেন ।

‘তোমার জিনিস নাকি ?’ প্রতিবাদ করে গোবরা : ‘বৌদ্ধির
জিনিস না ? তুমি কি তোমার নিজেৰ জিনিস ?’

‘ওই হোলো !’ বলে ফোস করলেন দাদা : ‘কেন তুইও কি
যাসনি আমার সঙ্গে ? তুই ত আমার জিনিস। আমি তোর
ভিত্তাবক না ? তখন চোর ধরতে কী হয়েছিল তোর ?’

‘তারপরে ? চোরের হাত থেকে উদ্ধার পেলেন কি করে ?’
মি জিজ্ঞেস করি।

‘যেমন করে পায় মাঝুম !’ তিনি বলেন : ‘চুরির ধন বাট-
ডিতে যায় শোনেননি ? তারপর চোবের হাত থেকে বাটপাড়ের
তে গিয়ে পড়লাম আমরা !’

‘বাট বটে ?’ আমার সকৌতুক কৌতুহল : ‘তা শেষ মেষ
ফার পেলেন ত ? পেতেট হবে উদ্ধার শেষ পর্যন্ত। গোয়েন্দা
তিনৌর দস্তুর ! তা উদ্ধারটা করল কে ?’

‘ডাকাত এসে পড়ল শেষটায়। ডাকাত আসতে দেখেই না
টপাড়টা উধাও ?’

‘ডাকাত এসে পড়ল আবার এর ওপর ?’

‘ঝঃ, শুর বৌদি বাপের বাড়ি থেকে যেই না দরজায় এসে হাঁক
এক শুক করেছে তাই না শুনেট উকি মেরে দেখেই না শেই
টপাড়টা খিড়কির দোর দিয়ে সটাং !...বৌ না তো ডাকাত !’

‘আমার ডাকসাইটে বৌদির নামে যাত্তা বোলো না, বলে
দচ্ছি !’ গোসা হয় গোবর্ধনের।

‘ওই হোলো ! তোর কাছে যা ডাকসাইটে আমার কাছে
তাই.....’

‘থেতে দিন !’ পারিবারিক কলহের মাঝখানে পড়ে আমি
মিটিয়ে দিই : ‘আপনাদের চুরি যাওয়ার কাহিনীটা খলবেন ত
আমায়। সেবারকার আপনার যুক্ত যাওয়ার গল্পটা বলেছিলেন,
সেটা লিখে তু পয়সা পিটেছিলাম, এবারও এটার থেকেও.....’

‘বলব আপনাকে এক সময়। কারখানার অন্ত এখন একটা

লোহার সিন্দুক কিনতে যাচ্ছি। চোর বাবাজী আবার পুরে এই
সেটা ভাঙা আৱ সহজ হবে না তাৱ পক্ষে এবাৱ।’

পৰদিন সকালে শ্ৰীমান গোৰধন এসে হাজিৰ। ‘দেখুন এই বি’
পনটা দিতে যাচ্ছি আনন্দবাজারে, দেখুন ত হয়েছে কিনা ঠিক?’

গোৰধন তাৱ কালজৱী সাহিত্য কৌৰ্�তি আমাৱ হাতে দেয়।

বিজ্ঞাপনেৰ কপিটিতে ওদেৱ চেতলাৰ বাসাৰ ঠিকানা দিয়ে হৈ
আছে দেখলাম… ‘প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবশ্যক। আমাৰ
বাড়িৰ একটি ঘৰে বহুমূল্য তৈজসপত্ৰ রক্ষিত আছে, সেই ঘৰেৰ
লাগাও একটা জলেৰ নল উঠে গেছে সোজা উপৰে, সেই নল কে
কেউ যাতে না উঠতে পাৱে সেই দিকে নজৰ রাখাৰ জন্য বিচ
এক গোয়েন্দাৰ দৱকাৰ। উপযুক্ত পারিশ্রমিক।’

‘বুঝেছি। অল্প ধেমন জল বাড়ে, আমি ঘাড় নাড়লাম, তেওঁ
বিজ্ঞাপনটা দিয়ে আৱেকটা ঐ রকম কাও বাধাৰে তুমি দেখ!'
চোৱটা সেই পাইপ বেয়ে উঠবে আৱ তোমাৰ ঐ ডিটেকটিভ গি
হাতে নাতে পাকড়াবে চোৱটাকে। তাই না?’

‘সে আপনি বুঝবেন না। সে সব আপনাৰ মাথায় খ্যালে না
বলে চলে গেল গোৱৱা।

দিন কয়েক বাদে একটা লোক এসে ডাকল আমায়—‘আঁ
আনুন। চটপট চলে আনুন আমাৰ সঙ্গে।’

অপৰিচিত আহ্বানে আমি ধৰ্মত খাই—‘আপনি…আপনা
তো আমি…’

‘চিনতে পাৱছেন না আমাকে? ছদ্মবেশে রয়েছি কিনা,’ ব
লোকটা তাৱ দাঢ়ি গোফ খুলে ফ্যালে। ‘গোৱৱা ভায়া!
অদ্ভুত বেশ কেন? এৱ মানে?’

‘চোৱ ধৰতে যাচ্ছি যে। ডিটেকটিভদেৱ ছদ্মবেশে ঘোৱাখে
কৱতে হয় না? আপনাৰ জন্মেও একজোড়া দাঢ়ি গোফ এনে
পৱে নিন চঠি কৱে…’

‘আমি, আমি আবার কেন ?’

‘আপনাকেও ছল্পবেশ ধারণ করতে হবে ত। আপনি আমার ছরেদ ত এ যাত্রার। ব্রকের যেমন স্থিত, বিমলের যেমন ট্রার। তেমনি আপনি আমার সহযোগী গোয়েন্দা যখন তখন পনাকেও ত...’

‘তুমি পরলেই হবে। আমাকে আর পরতে হবে না ছল্পবেশ।’
সাম আমি : ‘দাঢ়িওয়ালা লোকের ছায়া মাড়াই নে আমি জানে নই। তোমার সঙ্গে ঘূরলে কেউ আর আমায় আমি বলে সন্দেহ বে না।’

‘তাহলে আমুন চট্টপট। এই ফাঁকে চেতলার বাজারটা ঘূরে নিসি একবার।’ বলল সে : ‘দাদা ও আবার বাজার করতে রিষেছেন কিনা এখন। পাছে আমায় চিনতে পারেন, আমার বেশ ধারণের সেও একটা কারণ।’

‘বুঝেছি।’ বলে বেকলাম ওর সঙ্গে। বাজারের মুদিখানালার পাশ দিয়ে যাবার সময়, হঠাতে একটা লোককে জাপটে ধরে টেঁয়ে উঠল গোবরা—‘ধরেছি—ধরেছি চোর ! পাকড়েছি টাকে। একটা পাহারোলা ডেকে আমুন এইবার।’

কোনোই দোষ করেনি লোকটা। মুদীর সঙ্গে তেজপাতার কষাকষি করছিল, এমন সময় গোবরা ঝাপিয়ে পড়েছে তার পুর। এমন খারাপ লাগে আমার !

লোকটা বাবারে মারে বলে ডাক ছাড়তে থাকে। আর বিরাও দাদাগো ! বৌদিগো ! বলে চেঁচায়।

কাছেই কোথায় বুঝি বাজার করছিলেন দাদা, ভাস্বের ইঁকড়াকে সে হাজির—কী হয়েছে রে এমন ঝাঁড়ের মতন চেম্পাচ্ছিস কেন ?’

‘পাকড়েছি তোমার চোরকে। এই নাও। ধরো।’

লোকটা তখন হর্ষবর্ধনের পাজড়িয়ে ধরে—‘দোহাই বাবু !

পুলিশে দেবেন না। সেদিন আমি তুবছর খেটে বেরিয়েছি, এবং
গেলে ছ বচ্ছরের অশ্ব ঠেলে দেবে জেলে।'

'বেশ দেব না পুলিশে। বের করে দাও আমাদের মালপত্র
'সব বার করে দেব। চলুন।' সকৃতজ্ঞ লোকটা আমার
সঙ্গে করে তার বস্তির কুঠরিতে নিয়ে যায়। বার করে দেয় হ'
বর্ধনের আশী হাজার টাকার নোটের বাণিল।

'আর আমার তৈজসপত্র? সে সব গেল কোথায়?'

গোবরার তস্মি।

'ওই যে ওই কোণায় ধরা আছে বাবু! নিয়ে যান দয়া করে
ঘরের কোণে ছুটো বস্তায় পাশাপাশি খাড়া করা দেখলাঃ
এগিয়ে গিয়ে বস্তার ভেতরে উকি মেরে দেখি.....

'একি! খালি তেজপাতা দেখছি যে? এই কি তোমার...'

'তৈজসপত্র!' জানায় গোবর্ধন। 'তেজপাতাকে সাধু ভাষ
কী বলে তাহলে? লেখক মাঝুষ আপনি, বাংলা জানেন না?'

অবাক করল গোবরা! কী বলে ও? বাঙালী লেখক হচ্ছে
হলে আবার বাংলা ভাষা জানতে হয় নাকি? আশচর্য!



ପୁଣ୍ଡିତର ଗୁଣପନ ।

ଶୀଳା ମହମଦାର

ଆମାର ପିସିମା ଭୌଷଣ ଭାଲୋ ହଲେଓ ବେଙ୍ଗାୟ ଭୀତୁ । ସବ କିମିସେ ତୋର ଭୟ । ଯେଥାନେ ଯା ଆହେ ତାତେ ତୋ ଭୟ ଆହେଇ, ଖାବାର ଅନେକ ଜିନିସ ନେଇ ତାକେଣେ ଭୟ । ବଡ଼ଦିନେର ଛୁଟିତେ କବାର ଗେଛି ତୋର ବାଡ଼ିତେ । ମଫଃସଙ୍ଗ ଶହର । ଖାବାର-ଦାବାରେର ଗାରି ସୁବିଧା । ହଣ୍ଟାୟ ହଣ୍ଟାୟ ଧୋପା ଆସେ, କୁଡ଼ି ଟାକା ମାଇନେତେ ଏକ୍‌ପାଟ ଚାକର ପାଓୟା ଯାଉ । ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଏବଂ ପିଛନେ ନିଜେଦେର ବାଗାନ, ଦୁ'ପାଶେ ପାଶେର ବାଡ଼ିଗୁଲୋର ବାଗାନ ; ସାମନେ ଡାକ୍ତାରେର ବାଡ଼ି । ମୋଡେର ମାଧ୍ୟାୟ ସିନେମା । ଖେଳାର ମାଠେ ଅଭିବହର ଏଇ ମୟ ଗ୍ରେଟ ସରୋଜିନୀ ସାର୍କାସେର ତୋବୁ । ତାହାଡ଼ା ଶ୍ଵାନକାର ପ୍ର୍ୟାଡା ମାର କ୍ଷୀରେର ପାଞ୍ଚମୀ ବିଦ୍ୟାତ । ଆର ଏନ୍ତାର ମୁର୍ଗି ପାଓୟା ଯାଉ । ଏମନ ଜ୍ଞାଯଗା ସପ କରେ ବଡ଼ ଏକଟା ଦେଖା ଯାଇ ନା ।

ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗେଇ ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନେମେଛି । ଶିରଶିର କରେ ଗାହେର ପାତାର ମଧ୍ୟେ ଦିର୍ଘେ ହାଓସା ବଇଛେ । ଠାଠାଂ କରେ କୋଥାଯ ଏକଟା ଗାଠଠୋକରା ଗାଛ ଠୋକରାଚେ । ଲୋକେର ବାଡ଼ିତେ ଉଛୁନେ ଆଚ ଡେବେ । ପିସିମାର ଗେଟେର ଓପରେ ଥୋକା ଥୋକା ଫୁଲ ଫୁଟେଛେ । ସଦିନ ରାତ୍ରେ ସଥନ ବଡ଼ ଖାଟେର ପାଶେ ଆମାର ଛୋଟ ଲେଓରାରେର ଖାଟେ ଲପ ମୁଢ଼ି ଦିରେ ଶୁଳାମ, ତଥନ ଖାଲି ମନେ ହଞ୍ଚିଲ ଦଶ ଦିନେର ବଦଳେ ଏହି ଏକଶୋ ଦିନ ଏଥାନେ ଧାକତାମ କି ମଜାଟାଇ ନା ହତ !

କିନ୍ତୁ ସେକାଲେର ଏକ ଖୁବି ଯେ କଥା ଭୁର୍ଜପାତାର ଖାତାୟ ଖାଗେର ଲମ୍ବେ ଲିଖେ ଗେହେନ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀତେ ନିରବଚିହ୍ନ ମୁଖ ସଲେ କିଞ୍ଚିତ୍ ନା, ସେଟା ଠିକ । ପରଦିନ ଭୋରେ ପିସିମାର ସଙ୍ଗେ ନିଚେ ନେମେଛି । ପରନେର ବାରାନ୍ଦାର ଝାଲେର ଦରଜାର ଛିଟକିନି ଖୁଲେ ଗୟଲାନୀର କାହେ

আমার জন্যে বেশি করে দুধ নেওয়া হচ্ছে, এমন সময় গয়লা।
বললে—‘তালার ব্যবস্থা করুন মা। জালের ফোকর দিয়ে হা
গলিয়ে এ দরজাটা খুলে ফেলতে দুষ্ট লোকের কভটুকু সা
লাগবে !’

পিসিমা বললেন—‘কি বলিস বাতাসি, শুনলেও হাত-
কাপে !’

বাতাসি বললে—‘না, বলানগড়ের জেলখানা থেকে গুপ্তি
পালিয়েছে কি না তাই বলছিলাম !’

গুপ্তিতের নাম শুনেই পিসিমার বুক কেঁপে উঠল। এ
জ্ঞান করে হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, তুইও যেমন, কি এমন সোনাদা
আছে আমার ঘরে যে জেলভাড়া ডাকাত ধরা পড়বার ভয় ভূ
আমার বারান্দার ছিটকিনি নামাবে ?’

হৃদের ক্যানেস্টারা নামিয়ে সিঁড়ির উপর বসে পড়ল বাতাসি।
আমার দিকে তাকিয়ে এতটা গলা নামিয়ে যাতে আমি স্পষ্ট শুনা
পাই, বললে—‘আহা সোনাদানা নয়, ওনাদের দল আছে, ত
ছেলেধরা করে নিয়ে যায়। তারপর বেনামা চিঁটি দেয় স্বাদরিবৎ^১
কালী-মন্দিরের পেছনে বটতলাতে হাজার টাকা পুঁতে এসো। ত
ভাইপো ফিরিয়ে দেবো। না দিলে—’ এই বলেই বাতাসি এম
ভাবে চুপ করল যে পিসিমা কেন, আমারই গা শিউরে উঠল।

বারান্দার কোণায় কাঠের টেবিলে বড় স্টোভে পিসিমার বু
চাকর হরিন্দম চায়ের জল ফুটোচিল, সে এবার বেরিয়ে এ
বললে—‘আর ভয় দেখাবার জায়গা পাস নি বাতাসি ?
ছেলেকে কেউ নিয়ে গেলে ফেরত দেবার জন্যে পয়সা চাইবে
বৱং পয়সা দিয়ে ফেরত দেবে !’

বাবা বলেন হরিন্দম বলে নাম হয় না, অরিন্দম হবে। এ
হতেই বললাম কথাটা। শুনে হরিন্দমের কি রাগ ! বললে—‘ই
আমার বাবা নাম রাখল হরিন্দম আর ওনার বাবা তার চেয়ে বে

নেন ! তাও যদি তাকে দারোগাবাবুর কাছে কানমলা খেতে না
খ্তাম !

পিসিমা রেগে গেলেন—‘ওসব কি শেখাচ্ছ বাপকে অশ্রদ্ধা
রতে, হরিন্দম ?’

হরিন্দম বললে, ‘হরি মানে ভগবান, তা ভগবানের নাম এনাদের
ব আজকাল ভালো লাগবে কেন ? অরিন্দম একটা নাম হল ?’

বাতাসি হেসে দুধের ক্যানেস্টারা নিয়ে উঠে পড়ল। যাবার
াগে বলল, ‘তুধ নেবার সময় দারোগাবাবুর মা বললেন, গুণ-
গুণিত এদিককাঁর ছেলে নয়, কড়িগাছায় ওদের সাত পুরুষের বাস।
খানেই পুলিশ আগে যাবে গো মা, কাজেই সেদিকে না গিয়ে
আগে এদিকে তার আসা ! পরে গোলমাল চুকে গেলে পর এই
জন কোশ পথ পেরিয়ে গুটিগুটি হয়তো মায়ের সঙ্গে দেখা করে
বৈ ! এ আমার দারোগাবাবুর মার মুখ থেকে শোনা মা, তাই
লে গেলাম !’

বাতাসি গেলে পর রুটি, টোস্ট, ডিমভাজা, চিনি দিয়ে কালকের
ধূধের সর, এই সব আমাকে দিতে দিতে হরিন্দম বললে—‘বাতাসির
যমন কথা ! তালা-চাবিতে গুণপণিতের কি করবে ! মন্ত্র বড়
গুণিত সে, নানা রকম মন্ত্র জানে, কি একটু পড়ে দেবে, তালা
মাপনা থেকে খুলে যাবে !’

পিসিমা চটে গিয়ে বললেন—‘পণিত না আরো কিছু, ঠ্যাঙাড়ে
ওঞ্চা বল !’

ঠিক এই সময় পিশেমশাইও নেমে এসে চায়ের টেবিলে বসে
লাগলেন—‘কে ঠ্যাঙাড়ে ওঞ্চা ?’

পিসিমা তাঁকে খাবার দিতে দিতে বললেন—‘গুণপণিত নাকি
যুবেদ ভেড়ে ফেরাবী হয়েছে ! বাতাসি বলছিল এ মুখে হবার
স্তাবনা, দারোগার মা নাকি বলেছে ?’

ডিম খেলে পিশেমশায়ের হেঁচকি ওঠে, তাই সকালে পাঁউরুটি

সাদা মাধুন আর জেলি দিয়ে থান। তাতে এই-বড় একটা কাম।
দিয়ে বললেন—‘একেবারে বাঘা ডাকাত ও গুপ্তিত, বুঝি।
গুপ্তি ! প্রাণে এতটুকু ভয়ড়র নেই, যা করবে ঠিক করেছে তা
করবেই, মেরে ধরে ঠেঙিয়ে, বোকা বানিয়ে যেমন করে হোক
ভাবতে পারিস সরকারী গুদোম থেকে পাঁচ হাজার মণ ধান এক
সারি গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কেটে পড়ল। বলল নাবি,
দিল্লী থেকে ছুরুম হয়েছে গায়ে গায়ে বিলি হবে। সাতদিন বায়ে
থেঁজ হল। তাও ধরা পড়ত না, শুধু চৌকিদারটাকে দেরি করে
তালা খোলার জন্মে টেনে এক চড় কষিয়েছিল, সেই রেগে মেঝে
ধরিয়ে দিল। একটা মুখোস পর্যন্ত পরে আসে নি এমনি সাহস !’

পিসিমা চায়ের পেয়ালায় ছোট একটা চুমুক দিয়ে শুকনে
গলায় বললেন—‘বাঃ, তুমি দেখছি গুপ্তিতের ভারি ভক্ত হচ্ছে
উঠেছ ! তার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ !’

সামনের বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুর ভাই শৈলবাবু মাঝে মাঝে
গল্প করতে আসেন। তিনি নাকি ছোটবেলায় একবার খুব বাতে
ভুগেছিলেন বলে কাজকর্ম সে-রকম করতে পারেন না, পিসিমা
বলেন। শৈলবাবু বললেন—‘সাংঘাতিক লোকটা, একটা কিছু
করবে ঠিক করলে কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। সে নাকি
অনেক রকম ভেঙ্গিষ জানে। কার যেন বক্ষ সিন্দুক থেকে হীরের
আংটি বের করে নিয়েছিল সিন্দুক না খুলেই। খুব সাবধানে
থাকবেন বৌদি !’

মাছ বিক্রী করতে ঘনশ্যাম এল। সেও বললে—‘বাবা !
সাবধানের মার নেই, ছেলেপুলে নিয়ে রয়েছেন মা !’ পিসিমা
বিরক্ত হয়ে বললেন—‘পুলিশ দারোগা ডিটেক্টিভ সবাই লেগেছে
আজ সঙ্কের আগেই তাকে ধরে ফেলবে দেখিস। কেন মিছিমিছি
ভয় দেখাচ্ছিস বল দিকিনি ?’

ঘনশ্যাম বললে—‘ধরা কি এতই সহজ মা ? থানে থানে নাবি

ঠার আন্তর্না আছে। এক এক জায়গায় এক এক নাম, এক এক
পক্ষম চেহারা। তুড়ি মারতেই ভোল বদলে ফেলে, এই এক
পক্ষম দেখছেন, এই দেখবেন অন্য রূপ! লোকে বলে এমনিতে
হইয় না, তুক করে !

‘বেলা যতই বাড়তে থাকে সবার মুখে ঐ এক কথাই ফেরে—
গুণপত্তি জেল ভেঙেছে। সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে সেই
চৌকিদারের ধড় আর মাথা এক জায়গায় থাকতে দেবে না। মজা
হয়েছে যে চৌকিদারটাও চাকরি ছেড়ে কোথায় গিয়ে যে গাঁচাকা
দিয়েছে কেউ আনে না। সবাই বলছে, তাকে খুঁজে বের না করে
নাকি গুণপত্তি ছাড়বে না। এদিকেই নাকি সব জায়গায়
আঁতিপাতি করে খুঁজবে। তাহাড়া সরেজমিনে বমাল সমেত ধরা
পড়েছিল, গুণপত্তির আপাততঃ কিছু রোজগার পাতির দরকার
পড়েছে। কাজেই সবাই সবাইকে সাবধান করে দিতে লাগল।

মাঝখান থেকে আমার ছুটিটাই না মাটি হয়। পিসিমা ঘন-
গ্রামকে সঙ্গে করে একটু পরেই দারোগা-গিন্নির কাছে খবর সংগ্রহ
করতে গেলেন। ফিরলেন সেই বেলা এগারোটার পর। তখন
আর আমার মাছের চপের সময় রইল না, এমনি ঘোল খেতে
হল। পিসিমা দুটো বড় বড় মাছ-ভাজাও আমার পাতে দিয়ে
বললেন—‘একা একা মোটে বেরবে না, কেমন বাবা? সাংঘাতিক
দুর্দশ ডাকাত, দু-একটা ছোট ছেলেকে নির্খেজ করে দেওয়া ওর
কাছে কিছুই নয়।’

শুনে আমার হয়ে গেছে, কবে থেকে কত আশা করে আছি।
বললাম—‘তবে কি ঘোষদের পুরোনো পুরুরে মাছ ধরতে যাব না?’
পিসিমা ভয়ে চীৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—‘ও
বাবা! ও কথা মুখে আনিস নে, তোকে ডুবিয়ে দিয়ে কাদার
মধ্যে ছিপ পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ! কথা দে পুরুরে যাবি নে।
বিকেলে মাংসের সিঙাড়া করব।’

ছাপাখানার বটকেষ্টবাবু তাঁর এক গেরুয়াপরা গুরুভাইকে সঙ্গে
নিয়ে এলেন দুপুরে খাওয়ার আগে। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর
বেজায় ভাব, তাঁদের দেখে পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে বললেন—
‘বাঃ বটকেষ্ট, করমবাবা তো আমারও গুরু, ইনি তাহলে আমারও
গুরুভাই।’

বটকেষ্টবাবু ভারি চিন্তিত মুখ করে বললেন—‘সেইজ্যোই তেঁ
বনমালী ভাইজীবনকে তোমার কাছে আনলাম ঘেঁটু, গুরুদেবেক
কাজ করে বেড়ায়, যেখানে যেমন জোটে তাই খেয়ে শরীরের বি
হাল হয়েছে দেখেছ? তাই গুরুদেব চিঠি দিয়ে শরীর সারাবাই
জন্মে ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। পোড়াকপাইল্যা! এদিকে
আমার বাড়ি থেকে জানোই তো দশদিনের আগে তোমার বৌদিদি
বোনেরা নড়বে না।’

আর বলতে হল না। আমার সামনেই গেরুয়াপরা ভদ্রলোকের
এ বাড়িতে থাকার সব বাবস্থা হয়ে গেল। দোতলার ভালো ঘরট
তাঁর জন্য ছেড়ে দেওয়া হল। পিসিমা আর আমি নিচে নেমে
এসাম। তবে একটা সুবিধাও হয়ে গেল, ভদ্রলোকের নাবি
হুথ, ঘি, মুর্গি, ছানা, ডিম এইসব পথ্য! তাঁর মানেই আমাকেও
সমান ভাগ দেবেন।

বটকেষ্টবাবু উঠে পড়ে বললেন—‘ইয়ে, কি বলে, ঘেঁটু, বনমালী
ভাইজীবন আবার একটু নার্ভাস প্রকৃতির, দরজাটিরজাগ্রলে
তোমাদের যেন বড় শিটখটে মনে হয়, একটু ভেতর থেকে তালাব
বন্দোবস্ত করলে ভালো হয়—’

আমি বললাম, ‘ঘনশ্যাম বলেছে তালার কম্ব নয়, সে তুক করে
তালা খোলে।’

শুনে বনমালী ভাইজীবন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে
পড়লেন—‘তুক-তাকে যোগ দেবার যে আমার গুরুদেবের বাবা
আছে।’

বটকেষ্টিবাবু হেসে উঠলেন—‘আহা, তুমিও যেমন, ওসব মুখ্যদের আড়ানো কথা। তুক না আরো কিছু, গুদোমের তালা কি চীকিদারকে দিয়ে খোলায় নি বলতে চাও? সাবধানে থেকো বাই; তবে হয়তো দেখবে কালকের মধ্যেই ধরা পড়ে গেছে। এখানে কোনো ভয় নেই।’

বনমালীবাবু ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে বললেন—‘মানে, ভয় পাই না ঠিক, তবে আমার ছোটবেলা থেকে বুক খড়ফড়ের ব্যারাম মাছে কিনা! তাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে বটকেষ্টিবাবু গেলেন। ঠিক হয়ে গেল যে বনমালীবাবু আর সিঁড়িটিঁড়ি ভাঙবেন না, ধাবার দাবার, স্নানের জল সব দোতলায় পৌছে দেওয়া হবে। ধাবা! তার ভয় দেখে হেসে বাঁচি নে, পিসিমাকেও হার নিয়েছেন!

হপুরের খাওয়াটা ঠিক সেরকম জমল না। পিসিমারা ওঁকে নিয়েই ব্যস্ত তা আমাকে দেখবেন কি! আর হরিন্দম বললে আকি বেশি মাছের বড়া খেলে পেট কামড়ায়! এদিকে শীতের পুরে চারদিক অঙ্ককার করে মেঘ জমেছে, কনকনে হাওয়া বইছে।

এমন দিনে কি ঘরে বসে থাকা যায় কথনো? ওদিকে গ্রোনো পুকুরে মাছ ধরতে পিসিমার বারণ! অবিশ্বি স্টেশনের তুন পুকুরের কথা তো কিছু বলেন নি। হপুরে সবাই ঘুমুলে যন আরও অঙ্ককার করে এস, এই সময়ে মাছরা সব ধাঁই মারে। ছপটা নিয়ে গুটিগুটি পিছনের বারান্দার তারের দরজা খুলে যেই আতা-বাগানে ঢুকেছি, দেখি আতাগাছের তলায় সে দাঢ়িয়ে মাছে!

কি আর বলব! আরেকটু হলেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। টনিয়ে দেবার দরকার নেই, দেখলেই চেনা যায়, ছ-ফুট লম্বা চাগড়া জোয়ান, এতখানি বুকের ছাতি ইটের মতো শক্ত, পায়ের শিল্পে হাতুড়ির বাড়ি মারলেও কিছু হবে না, লাজ টকটক করছে

হু-চোখ আৰ একমুখ ঘন দাঢ়ি, পৱনে ঘোৱা নীল শার্ট আৰ হাফ-প্যান্ট। লুকিয়ে থাকবাৰ পক্ষে এৱ চেয়ে ভালো সাজ আৰ বি হতে পাৱে ?

আমাকে সে আঙুল বেঁকিয়ে ডাকল। বলল, ‘ধিদে পেয়েছে, খাবাৰ আন !’ বললাম, ‘হৱিন্দম ডুলিতে তালা দিয়েছে !’

অমনি পকেট থেকে একগোছা চাবি ফেলে দিয়ে বলল—‘এই নাকি ?’

দেখে আমাৰ গায়েৰ রক্ত জল ! ঢোক গিলে বললাম—‘তবে কি হৱিন্দম নেই ?’

লোকটা তো অবাক ! বলে, ‘কি জালা, বলছি তাৰ পেটব্যথা’ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আমি তাৰ জাতিভাই, খুব ভালো রাঁধি ! এখন যাও দিকি নি, ডুলিতে কি আছে আমাৰ জন্তে বেৱ কৰে আনো !’

অগত্যা তাই দিলাম ; আট-দশটা মাছেৰ বড়া পাঁউকুটি দিয়ে সে দিবি খেঞ্চে ফেলল। হয়তো সেগুলো আমাৰই জলখাবাৰেৰ জন্ম তোলা ছিল। খেয়ে দেয়ে মুখ চাটতে চাটতে বলল—‘কি অমন কৱে তাকাছ কেন ?’ ধিদে পেইছিল, খেয়েছি তো হয়েছে কি ?’ যাচ্ছতাই রাঙ্গা হয়েছে বাপু। রাতে এৱ তিন হণ ভালো রেঁধে দেবো দেখো। হৱিন্দমেৰ পেটব্যথা, ও তো আৰ পাৱে না। তোমাৰ মা-বাবাকে বলে রেখো, হৱিন্দমেৰ জ্যাঠতুতো ভাই বাঁধবে !’

বললাম—‘মোটেই আমাৰ মা-বাবা নয়, পিসিমা পিসেমশাই। তাছাড়া এই যে বললে জাতিভাই ?’ লোকটা বিৰক্ত হয়ে বলল—‘ঞ্চ একই হজ, জ্যাঠতুতো ভাইৱা বুঝি জাতিভাই নয় ?’

তবু আমাৰ বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে একবাৰ আমাকে হৱিন্দমেৰ ঘৰ থেকে ঘুৱিয়ে আনল। নাক অবধি কম্বল চাপা হৱিন্দম গোঁ গোঁ কৱছে। দেখেই আমাৰ হাত-পা পেটে সেঁধিয়েছে ! সে

ରିନ୍ଦମକେ ବଜଳେ—‘ବଲ, ମାଥା ନେଡ଼େ ବଲ, ଆମି ତୋମାର ଜ୍ଞାତି-
ତାଇ, ତୋମାର ପେଟବ୍ୟଥା ହସେଛେ ତାଇ ଆମି ରୁଧିବ ।’

ହରିନ୍ଦମୁକ୍ତ ତାର କଥାମତୋ ମାଥା ନାଡ଼ିଲୋ ।

ପିସିମାକେ ହରିନ୍ଦମେର ଅସୁଖେର କଥା ବଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଇ କରା
ଗଲ । ସତିଯ ଧାସା ରୁଧି ଲୋକଟା, ସବାଇ ଖେଯେ ମହାଖୁଣି ।
ବନମାଲୀବାବୁର ଚେହାରା ବଦଳେ ଗେଲ, ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଛାଇ ରଙ୍ଗେ
ମୁଖଟାତେ ଏକଟି ରଙ୍ଗ ଧରଲ । ଆହଁ, ତାଇ ଯେନ ହୟ, ହରିନ୍ଦମେର ପେଟ-
ବ୍ୟଥା ଏ ଦଶଦିନ ଯେନ ନା ସାରେ । ଆମରା ଖେଯେ ବାଁଚି ।

ଲୋକଟା ଏଥିନ ନାମ ନିଯେଛେ ସଖାରାମ । ଦିବି ଶେଗେ ଗେଲ ସେ
ହରିନ୍ଦମେର ବଦଳେ ରାଜ୍ଞୀର କାଜେ : ସେଇ ଦଶଦିନ ପିସିମାର ବାଡିତେ
ସେ ଯେ କତ ରକମ ପରଟା କାବାବ କାଳିଆ ଝାଲଫିରେଜି ଇତ୍ୟାଦି ଚଲନ
ଆର ସେ କ୍ଷୀର ଚମଚମ, ଘରେ ତୈରୀ ମାଲାଇ ଯେ ନା ଖେଯେଛେ ତାକେ ବଲାଇ
ବୁଥା ।

ଅବିଶ୍ଵି ଆମି ଭାଲୋ କରେ କିଛୁ ଖେତେ ପାରି ନି, କାରଣ ଆମି
ଜାନି ସଖାରାମ ହଲ ଗୁଣପତି । ଭେଙ୍ଗି ଦିଯେ ରାଜ୍ଞୀ କରେ । ହରିନ୍ଦ-
ମେର ମୋଟେଇ ଦଶଦିନ ଧରେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହୟ ନି, ଗୁଣତାର ମୁଖେ ଗ୍ୟାଗ
ପରିଯେ ହାତ-ପା ବେଂଧେ କସଲ ଚାପା ଦିଯେ ରେଖେଛେ । ସବ ଜାନି, କିନ୍ତୁ
ବଲି କୋନ୍ ସାହସ ? ଏକ ନିମେଷେ ସବାଇକେ କଚୁକଟା କରେ ଫେଲବେ
ନା ? ବ୍ୟାଟାର ଏମନି ସାହସ ଯେ ଶେଷ ଦିନେ ରେଂଧେବେଡେ ପିସେମଶାୟେର
ବନ୍ଧୁବାଙ୍କବଦେର ପରିବେଶନ କରେ ଧାତ୍ରୀଳ । କେଉ କିଛୁ ସନ୍ଦେହଓ କରଲ
ନା, ଧାଲି ବନମାଲୀବାବୁ ଯୋଗୀପୁରୁଷ, ହସତୋ ବା ମନ୍ଦବଲେ କିଛୁ ବୁଝେ
ଥାକବେନ । ବାର ବାର ଓର ଦିକେ ତାକାଚେନ ଦେଖଲାମ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ଞୀର
ସବ ଚେଯେ ବେଶି ପ୍ରଶଂସା କରଲେନ ଉନିଇ ଆର ରୋଗା ପଟକା ହଲେ କି
ହବେ, ଖେଲେନାନ୍ତି ସବ ଚେଯେ ବେଶି !

ଧାତ୍ରୀଳ ଶେଷେ ସବାଇକେ ଜାଫରାଣ-ଦେଓଯା କ୍ଷୀରେର ସନ୍ଦେଶ ଦେଓଯା
ହଚେ, ଏମନ ସମସ୍ତ କଥା ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ଚାର-ପାଚ ଜନ ପୁଲିଶ
ଅଫିସାର, କନ୍‌ସ୍ଟେବଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏସେ ହାଜିର । ତାଦେର ପିଛନେ

হরিন্দমের মুখটা দেখেই আর আমাকে বলে দিতে হল না।
সখারাম রাখাবান্না নিয়ে আজ মশগুল, এই ফাঁকে কেমন ক
দড়াদড়ি খুলে পালিয়ে গিয়ে হরিন্দম পুলিশ ডেকে এনেছে।
ফ্যাকাশে রোগ। হয়ে গেছে হরিন্দম ! এবার আমাদের পোল
কালিয়া আওয়াও তা হলে ঘুচে !

পুলিশেরা ঘরে ঢুকতেই অবাক কাও ! বনমালীবাবু এক
অশুট চীৎকার করে পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় মারলেন। বি
সেখানেও স্লোক ছিল, দেখতে দেখতে তারা তাঁর হাতে হাতকা
পথল। আর সখারাম দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে ক্ষীরমাখা হাত দিয়ে
মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

কারো মুখে প্রথমটা কথা সরে না। তারপর সম্ভিং কিট
এলেই পিসেমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন—‘ও কি হল দারোগাবা;
বনমালীবাবু আমার গুরুভাই, আপনি কাকে ধরতে কাকে ধরছেন ?

দারোগাবাবু বললেন—‘ধরছি ঠিকই, এই রোগ। পটক। স্লোকটি
মেই বিখ্যাত ডাকাত গুণপঞ্জি !’

আমি আঙুল দিয়ে সখারামকে দেখিয়ে বললাম—‘আর
তবে কে ?’

এতক্ষণ পর বনমালীবাবু অর্থাৎ গুণপঞ্জি কথা বললেন—
হল চালগুদোমের চৌকিদার। ওর বুড়ো আঙুলের কালো আঁচিঃ
দেখেই চিনেছিলাম, তবে এত ভালো রঁধে বলে কিছু বলি নি
কিন্তু এখন তোকে বলছি শোন !’

বলতে বলতে আমাদের চোখের সামনে গুণপঞ্জির রোগ
পটক। শরীরটা যেন দুংগ বড় হয়ে উঠল, গলার আওয়াজ থেবে
বাজের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সখারামের মুখ কাগজের মতে
সাদা, হাত-পা ঠকঠক। গুণপঞ্জি বলতে লাগল, ‘শোন ভালো
করে। তিনি বছর বাদে আমি জেল থেকে বেরিয়ে

ଲି ଦେଖି ତୁହି ଆମାର ଶୁରୁଦେବ କରମବାବାର ଆଶ୍ରମେ ରାଁଧିଛିସ ।
ଜ୍ଞାନ୍ମୁଣ୍ଡ ଚଲେ ଯାବି ସେଥାନେ । ସେଟୁବାବୁ, ଦସ୍ତା କରେ ଓ ମାଇନେଟ୍ଟା
ଫିଲ୍ସେ ଦେବେନ । ତିନ ବହର ବାଦେ ଫିରେ ଏସେ ଆମି ରିଟାଯାର
ବୁବୁ, ବାକୀ ଜୀବନଟା ଆଶ୍ରମେଇ କାଟାବ । ତୁହି ଯେନ ହାଜିର ଧାକିସ,
ଗାଲୋ ଚାମ ତୋ ।’

ପୁଲିଶ ଅଫିସାରଦେର ଏକଜନ ଏକଟ୍ର କେଶେ ବଲଲେନ—‘ତିନ ବହର
ଶାବ, ସଞ୍ଚାରତଃ ଚାର; ଜେଲ ଭାଙ୍ଗାର ଫଳ ଆହେ ତୋ ।’

ଶ୍ରୀପଣ୍ଡିତ ଚୋଥ ପାକିଯେ ବଲଲ—‘ଏ ଏକଟି, ତିନେତେ ଚାରେତେ
ଛାଇଟା କି ହଲ ଶୁଣି ? ମନେ ଥାକେ ଯେନ ସଖାରାମ !’

ସଖାରାମ ଏକଗାଲ ହେସେ ହାତଜୋଡ଼ କରେ ବଲଲେ—‘ଆଜେ, ଆମି
ମଧ୍ୟ ଥେକେଇ ତେନାର ଶିକ୍ଷ୍ୟ ବନେ ଗେଛି । ତବେ ମାଇନେର କଥାଟା ଶାର
ଜନାକେ ଏକଟୁ ବଲେ ଦେବେନ ।’



ଓন্তাদে ওন্তাট
নাৰায়ণ গঙ্গোপাধ্যা

দারুণ গৱামে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বজ্জেশ্বর গড়গড়ির ঘূম ভাঙল।
ঘৰে ইলেকট্ৰিক পাথা সুৱচ্ছিল, সেটা কখন খেমে গেছে। একটা
পাঁচ পাওয়াৰেৰ নীল বেড-সাইড ল্যাম্প জলে, সেটাৰ নিবে রয়েছে
বাইৰেৰ জানালায় গুমোট মেঘে ঢাকা থমথমে ভাস্ত্ৰেৰ আকাশ
চাৰিদিকে নৌৱেট অঙ্ককাৰ, ঘৰেৰ ভেতৱে যেন সারি সারি কষ্টি
পাথৱেৰ দেওয়াল তুলে দিয়েছে কেউ। তাৰ মানে, আজই
ইলেকট্ৰিক ফেল কৰেছে। প্ৰায়ই এই কাণ্ড হচ্ছে আজকাল
জালাতন কৰে মাৰল। তবু দেখা যাক একবাৰ। বিছানা ছেঁ
উঠতে গেলেন বজ্জেশ্বৰবাবু।

তখন কে যেন কৰ্কশ খসখসে গলায় বললে, বিছানা থেবে
নাৰবেন না, যেমন আছেন তেমনি ধাকুন।

বজ্জেশ্বৰ বুৰলেন, অঙ্ককাৰে যদিও তিনি কাউকে দেখতে
পাচ্ছেন না, কিন্তু ঘৰে আৱ একজন কেউ আছে, যে তাকে দেখতে
এবং লক্ষ্য কৰছে। সে যে কে হতে পাৱে, চালাক-লোক গড়গড়ি
সেটা বুৰতে একটও দেৱী হৃষি না। তবু ভদ্ৰতা কৰে জিজ্ঞেস
কৰলেন, মাৰবাতে আমাৰ ঘৰে ঢুকে আলো-ফালো নিবিয়ে ভূতেৰ
মতন বাস রয়েছেন কে আপনি ?

উন্নৱ এল : আমি ভূত।

—তা, ভূত। তা গৱম-টৱম লাগছে না আপনাৱ ? আলো
না হয় না-ই জালেন, কিন্তু পাথাটা খুলতে আপনি আছে কি ?

—আপনি ছিল না, কিন্তু নীচেৰ মেইন শুইচ অফ কৰে
দিয়েছি।

—ভালোই করেছেন। গড়গড়ি বিরক্ত হলেন : তা হলে
রম আর ঘামে হালুয়া হোন বসে বসে।

—বেশিক্ষণ বসতে আসিনি। একটু দরকার আছে আপনার
সে। সেটা মিটলেই চলে যাব।

—কী, ঘাড় মটকাতে চান ?—গড়গড়ি গম্ভীর হয়ে বললেন,
প্রতি স্মৃতিধা হবে না। আমার বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু ছেলে-
স্ত্রীয় মশাই জাপানী ওস্টাদের কাছে যুৎসু শিখেছিলুম, তার
একটা প্যাচও আমি ভুলিনি। ওসব চালাকির চেষ্টা করবেন না।
গাধার যদি ভেংচি টেংচি কেটে ভয় দেখাতে চান, তা হলে আলোটা
ঢালুন, নইলে চাঁদমুখ দেখব কি করে। অঙ্ককারে আপনার
ঝাঁঁচানি শ্রেফ বাজে হয়ে যাবে।

।।।

না ভূত জবাব দিলে না। ঘুর-ঘুর-ঘুড়-ঘুড় করে ধানিকটা কাশল।

—কি রকম বিচ্ছিরি করে কাশলেন আপনি। ছপিং কাশি
যাছে নাকি ?

—কী বকছেন পাগলের মতো ? ভূত বিরক্ত হল : আপনি না.
একজন সাইন্টিস্ট ? বুড়ো বয়েসে কারো ছপিং কাফ হয় ?

—ভূতের ধৰ কী করে জানব মশাই ? কঁচার খুঁটে হাওয়া
ধতে ধেতে গড়গড়ি বললেন, কখনো তো রিসার্চ করার সুযোগ
নাইনি। আপনিই হচ্ছেন আমার জীবনের শুরুম ভূত। অবিশ্বি-
য়ামার এক ভাইপো ছিল—তার নাম ভূতো, ছেলেবেলায় গায়ে
গালি-ঝুলি মেঝে থাকত বলে আমি তাকে ডাকতুম ভূত। কিন্তু
খন সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে—লোকে বলে কমলাক্ষবাবু—
হত কিংবা ভূতো নামে তাকে যদি আপনি ডাকেন সে রেগে
গিয়ে আপনাকে জেল দিতে পারে।

শুনে, ভূত একটা হাই তুলল। বললে, আপনার সেই
কমলাক্ষকে আমি ভূত বা ভূতো কোনো নামেই ডাকতে চাই না ;

ডাকবার কোনো দরকার দেখছি না। আমি আপনার কাছে
এসেছি।

—আমার কাছে এসেছেন তো স্বিচ্চটাইচ বঙ্গ করে দিয়ে অঙ্গ
কারে হতুম-থুমোর মতো বসে রয়েছেন কেন? কী বলতে চ।
চটপট বলে ফেলুন। আপনারা নয় রাস্তারে চরে বেড়ান, কি:
আমাদের যে এটা সুমোবার টাইম সে-কথা ভুলে যাবেন না।
কথাবার্তা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন, কাল সকালে আবার
আমার গোটাকয়েক শক্ত শক্ত অঙ্গ কষতে হবে।

উত্তরে ভূত আবার সুঙ্গ সুঙ্গ করে কাশল।

—এং, এ কাণি তো আপনার ভালো নয়। ত্রনিক বলে মনে
হচ্ছে। ভালো ডাক্তার দেখান মশাই, শেষকালে আবার একাঁ
টি-বি ফি-বি হয়ে যেতে পারে।

—দেখুন, ওসব অলঙ্কুণে কথা বলে কু-ডাক ডাকবেন না
শুনলেই বুক কঁপে ওঠে। টি-বি আমার হবে কেন? আমা
শস্ত্রের হোক।

—তা হোক। কিন্তু আপনার শস্ত্র কে? ভূতের রোগ
বুঝি।

—শুধু ভূতের রোজা কেন। অনেকেই আছে। তার মধ্যে
আপনিও একজন।

—আমিও! বজ্জেবর গড়গড়ি একটা খাবি খেলেনঃ আমার
আবার টানছেন কেন এর ভেতর? আমি তো মশাই ভূত-সম্পর্ক
কোনোদিন কোনো কমেন্ট করিনি। ভূত বিশেষ মানি টানি
বটে, কিন্তু চিরকাল তাদের সমীহ করে থাকি।

—বকবকানি রাখুন। এবার কাজের কথা হোক।

—হোক। কিন্তু বেশি দেরী করবেন না। আমার এক
সুযুনো দরকার।

—শুনুন। আপনি কালকের খবরের কাগজে একটা প্রব

নথেছেন। তাতে জানিয়েছেন, বাড়ীতে আপনি একা থাকেন,
দুর বন্ধ করেন না, আলমারীর চাবি খুলে রাখেন আর সেই
আলমারীতে নগদ দশ হাজার টাকা রেখে দিয়েছেন। সত্য
ক না?

কানের কাছে একটা মশা অঙ্ককারে পিন্পিন্ করে উড়ছিল।
সুটাকে মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় গড়গড়ি ছ-হাতে চটাস্ করে তালি
জালেন। তারপর বললেন, হ্যাঃ—সত্য।

—সেই প্রবন্ধে আপনি আরো লিখেছেন যে ভারতবর্ষে এমন
কানো চোর নেই যে আপনার আলমারী থেকে সে টাকা চুরি
করতে পারে। কারণ আপনার সুম খুব পাতলা—মেংটি ইচ্ছুরের
গায়ের আওয়াজে পর্যন্ত আপনি জেগে ওঠেন। আপনার বালিশের
ঁচে ছ ছটে টোটা ভরা রিভলভার থাকে, আর আপনি ছ হাতে
ঁলি চালাতে পারেন। এক কথায় আপনি সারা দেশের চোরকে
যালেঞ্জ করেছেন, তাদের ইন্টেলিজেন্সকে ঠাট্টা করেছেন। করেছেন
ক না?—ভূতের গলা খুব কঠোর মনে হল।

—আজ্ঞে, তাও করেছি। এবার গড়গড়ি হাই তুললেন এবং
খের কাছে তুড়ি দিলেন একটা।

—প্রবন্ধের শেষে আপনি বলেছেন যদি কোনো চোর আলমারী
থকে সেই টাকা গায়ের করতে পারে, তা হলে বেলা তিনিটের সময়
মাপনি গড়ের মাঠে গিয়ে গুনে গুনে একষটিটা ডিগবাঙ্গী খাবেন।
আপনাকে সেই সুযোগ দিতেই আমি এসেছি। মানে আমি—ভূত
বাবার ঘড়ির ঘড়ির করে কাশতে লাগল।

—না মশাই, আপনার কাশিটা আদৌ ভালো ঠেকছে না।
মামার টেবিলে বাসকের সিরাপ আছে। অনুমতি করেন তো উঠে
এক ডোজ খাইয়ে দিই আপনাকে।

—থামুন, সিরাপের আমার দরকার নেই। ভূত ধমকে বললেন,
যখানে আছেন সেখানেই চুপ করে বসে থাকুন। আর শুনুন।

কালকেই তা হলে গড়ের মাঠে ডিগবাজী খাওয়ার জন্যে বৈ
হোন। আপনার মতো একটা বেঁটে আর ভুঁড়ো লোক হাফপ্য।
পরে ডিগবাজী থাছে—এটা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগবে:
অবিশ্বি দর্শকদের ভেতর আমায় আপনি চিনতে পাববেন না।

—তার মানে আমার দশ হাজার টাকা এখন আপনার পকেটে!

—নির্ধাৎ।

—আর আমার রিভলভার ছাটো ?

—আমার ছ হাতে। আপনার দিকেই তাক করে রয়েছি।
হা—হা—কিন্তু ভূত বেশিক্ষণ হাসতে পারল না, আবার ঘুঙ দ
করে কেশে ফেলল।

—উঃ, আপনার কাশিটা তো...

শ্টাপ—ভূত রেগে বললে, কাশির কথা ফের বলবেন তো আ
ধড়াম করে একটা গুলি ছুঁড়ে দেব।

—রিভলভার ছুঁড়তে জানেন তো ? শেষে গুলিও লাগবে :
আপনিও ধামোকা গঁতো গাঁতো থাবেন।

—শ্টাপ ! আমি রিভলভার ছুঁড়তে জানি না ? হা—হা—
হা—ঘড়র ঘড়র ঘড়—ঘড়...

—উহু আপনার কাশি...না মশাই, আমি উইথড করছি
মানে কথা হল, আপনি তা হলে ভূত নন ?

—না।

গড়গড়ি উদাস স্বরে বললেন, ভারী নিরাশ হলুম। অনে
দিন ধরেই ভূতের সঙ্গে আজাপ করবার ইচ্ছে আমার ছিল, হি
দেখছি, বরাতটাই আমার খারাপ।

তা হলে আপনি কে ?

—আঁমি ? হা—হা—হা—ঘড়র ঘড়—ঘড় !

—ঘড়র ঘড়র ঘড় ? যে রকম আপনি কাশছেন, আপনা
কাশীবাবু বলা যেতে পারে।

—শটাপ, আইসে ! ভূত চটে বললে, বেশি জ্যাঠামো কৱন না ! আমি কে জানেন ? এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা ।

—আঁ ! আপনি তবে সেই বিখ্যাত…

—হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লা । শোকে যাকে ক্ষেপে এডো হরি বলে থাকে । পাকিস্তানে যে হরি মোল্লা । ৫ ছয় মাসে আমিই দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ-চাকা-রাণ্ডু-গুগুতে একুনে বাহাস্তরটা চুরি করেছি । ভারত-পাকিস্তানের পুলিশকে স্বেফ ঘোল খাইয়ে দিয়েছি ।

—কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য ! বজ্জেব গড়গড়ি বিনয়ে গলে লেন : আমি ভাবতেই পারিনি যে আমার এই গরিবের কুঁড়েতে পনার মতো মহাজনের পায়ের ধুলো পড়বে । এখন কী দিয়ে পনাকে আপ্যায়ন করি বলুন তো ? আমার এই ঘরেই ল্যাম্প আছে, আপনাকে এক পেয়ালা কফি করে দেব কি ? ভাঙ্ডারের জিডিয়ারে সের তুই কড়াপাকের সন্দেশ আছে—তাই কি এনে ব এক প্লেট ?

—কিছু করতে হবে না আপনাকে । এডো হরি বললে, রাত ডৃটায় কফি খাওয়ার মতো বাজে অভ্যেস আমার নেই । আর ডু পাকের সন্দেশের কথা যদি বলেন, আপনি ভদ্রতা করবার আগেই ফ্রিজিডিয়ার খুলে সেটা চেখে এসেছি । বেড়ে সন্দেশ-লা । তবে সবটা খাইনি । আপনার জন্তে দেড়খানা আমি খে দিয়েছি ।

—হ্যাঁ, কী মহাশয় শোক আপনি ! কী স্বার্থত্যাগ !

—তা বলতে পারেন । আমি বিবেচনা করেই কাজ করি । পনার আলমারীতেও একখানা হৃটাকার নোট রয়েছে দেখতে আরেন । কালকের বাজার খরচা । সকালে উঠেই শোকের কাছে র করতে বেরবেন, এ আমার পছন্দ নয় । ঘড়-ঘড়-ঘড় ।

: অভিভূত হয়ে গড়গড়ি বললেন, কী বিবেচনা । সত্য বলছি

আপনার মতো এমন বিবেকবান এমন চরিত্রবান চোর আমি কখনো
দেখিনি কাশীবাবু ।

—শ্টাপ !—এড়ো হরি চেঁচিয়ে বললে, আমার নাম খারাপ
করবেন না । আমি কাশীবাবু নই ।

—তবে কি গয়া বাবু ? না—না—সরি, আপনি হচ্ছেন
এড়োয়ার্ড হরিপদ পাল্লা ।

—পাল্লা নয়, মোল্লা ।

—সরি, মোল্লা । জানেন, মোল্লা শুনেই আমার মোল্লাচকের
দইফের কথা মনে পড়ে । বেড়ে জিনিস । খেয়েছেন কখনো ?

—না, খাইনি । এড়ো হরি একটু উৎসাহিত হলেন : আছে
নাকি আপনার ফ্রিজিডিয়ারে ? কই, দেখিনি তো ? কয়েকটা
চিংড়ি মাছ আর মূসো ফুলো কী দেখলুম, কিন্তু দই তো…

—দই নেই, থাকলেও আপনাকে খেতে বারণ করতুম ।
আপনার যা কাশির ধাত—রাতে দই খাওয়া আদৌ ঠিক নয় ।

—ধামুন, বার বার কাশি কাশি বলবেন না । ওতে আমার
মেজাজ খারাপ হয়ে যায় । শুনুন, আপনাকে আমি বলতে চাই
যে এইবারে আমি পাশের এই জানালাটি দিয়ে চলে যাব ।
আপনার দশ হাজার টাকার জগতে ধন্তবাদ, আর রিভলভার ছটোও
আমি রাখলুম । আমার কাজে লাগবে । ভালো কথা—কাল
তিমটের সময় গড়ের মাঠে যাচ্ছেন তো ?

—যেতেই হবে, উপায় নেইতো । বজ্রের গড়গড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস
ফেললেন : আমি ভেবেছিলুম ছিঁচকে চোরদের নিয়ে একটু রগড় করব,
কিন্তু স্বয়ং চোর-সদ্বাট আপনি এসে পড়বেন, সেটা বুঝলে কি আর
ওসব ধাষ্টামো করতে যাই ? তা দয়া করে একটা উপকার যদি…

—কী উপকার ? এড়ো হরি প্রসন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ।

—আপনি আমার মোটা গদীওয়ালা ডেক চেয়ারটাতেই বসে
আছেন তো ?

—নিশ্চয়। খুব ভালো চেয়ার মশাই। বসে যা আরাম !
নেহাঁ পেল্লায় বড়ো, নইলে কাঁধে করেই নিয়ে যেতুম।

—হে—হে—ধন্তবাদ। তা একটা কাজ করবেন ? চেয়ারের
পাশেই টিপয়ের ওপর টেলিফোন আছে। মানে টিপয়মুক্ত ফোনটা
যদি এগিয়ে দিতে পারেন, তা হলে আমি লালবাজারে একটা
খবর দিতুম।

—লালবাজারে কেন ?

—বারে, তারা তো আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছে কিনা—
একবার দেখতে পেলে ভারী খুশি হত।

—তাই নাকি ? হা—হা—ঘঙ-ঘঙ-ঘঙ—এক সঙ্গেই হাসলেন
আর কাশলেন এডোয়ার্ড হরিপদ মোল্লাঃ তাদের খুশি করতে
আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—বুঝলেন না ? আর সাবাদিন চোর-
টোর ধরে বেচারারা এখন ষুমুচ্ছে, এত রাতে আর তাদের কাচা
সুম ভাঙিয়ে কী লাভ ? তা ছাড়া, টেলিফোনের সাইনটাও আমি
কেটে রেখেছি।

—কেটেছেন ? তা হলে কী আর হবে ! ভাড়ারের কাবার্ডে
আর একটা লুকানো ফোন আছে—সেইটে দিয়েই একটা রিং করি,
আর নৌচের স্বিচ্চটাও খুলে দিয়ে আসি।

—অ্যা—ভাড়ারের কাবার্ডে ! ফোন আছে ? এডোয়ার্ড
হরিপদ মোল্লা লাফিয়ে উঠতে গেলেন এবং পরক্ষণেই দারুণ চিংকার
ছাড়লেন : একি !

এবার বজ্জ্বর গড়গড়ি গোফে তা দিলেন। বললেন : ও কিছু
না। চেয়ারটাকে আপনি পছন্দ করেছেন, চেয়ারটারও খুব পছন্দ
হয়েছে আপনাকে। চেয়ারে আপনি বসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশ
থেকে দুটো লোহার হাতজ এসে বেড়োর মতন আপনার কোমর
আটকে ধরেছে, সকালে কামার না এলে ও আর খোলা যাবে না।

—অ্যা !

—আজ্ঞে, এই সব নিয়েই তো আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা।
ওই চেয়ারটা যে আমি স্পেশালি আপনার জন্মেই তৈরী করেছি।

—আমার জন্মে। বাইরের মেঘের ফাঁক দিয়ে টাঁদ উঠেছিল
তার আলো। পড়েছিল ঘরে। সেই আলোয় এড়ো হরির খিড়ে
মতো মুখখানা দেখতে পেলেন গড়গড়ি। এড়ো হরি খাবি খেকে
আবার বললেন : আমার জন্মে ?

—কী করা যায়, বলুন ? লালবাজার কিছুতেই আপনাবে
কায়দা করতে না পেরে আমার শরণ নিয়েছিল, শাস্তিপ্রিয় নাগরিক-
দের কর্তব্য হিসেবে আমি মাঝে মাঝে তাদের সাহায্য করে থাকি।
তাই আপনার জন্মেও কিছু আয়োজন আমি করে রেখেছি। শুটাই
না বসে আপনি যদি টুলটায় চাপতেন, তা হলে হঠাৎ সেটার
মাঝখানে ফাঁক হয়ে আপনি গলে যেতেন বস্তাবন্দীর মতো। যদি
মোড়ায় বসতেন, চারদিক থেকে চামড়ার বেল্ট নাগপাশের মতে
আচ্ছে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলত আপনাকে। ডেক চেয়ারে বসেই ভালো
করেছেন। সব চাইতে আরামেই রয়েছেন আপনি।

হরি মোল্লা আর্তনাদ করলেন : আমার দু হাতে দুটো রিভল-
ভার—গুলি করব...

—টুর পিস্তল, ফুট করে আওয়াজ হবে কেবল। শুন,
প্রবন্ধটাও আপনার আশাতেই লেখা। জানতুম চালেঞ্জ আপনি
নেবেনই। তা আপনি আরাম করে বসুন। আমি ফোনটা করে
আসি, স্লাইচটাও খুলে দিই। গরমে প্রাণ গেল মশাই !

উন্তরে হরি মোল্লা ঘঙ—ঘঙ—ঘঙ—ঘঙর করে কাশলেন।

—উঁঁ আপনার এই কাশিটা আদো ভালো নয়, টি-বি ফি-বি
হয়ে যেতে পারে। এক ডোজ সিরাপ না খাইয়ে কিছুতেই
লালবাজারে আপনাকে আমি যেতে দেব না কাশীবাবু—এই বলে
বজ্রেশ্বর গড়গড়ি ভাড়ারের দিকে পা বাঢ়ালেন।



গাবিন্দ গোয়েন্দা।

ধীরেন্দ্র মাল ধর

কলকাতার কাছেই ।

আগে এটি একটি ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হবার পর এখানকার পতিত জমিতে বাস্তুহারার দল নতুন বসতি করেছে, যামে উঠেছে এই অঞ্চল। হাই স্কুল ও হাসপাতাল হয়েছে, ফরেকটি ছোটখাটো মাঝারী কারখানাও বসেছে, আড়ৎদারীও শুরু হয়েছে।

এখানকার এক কারখানায় য্যাপ্রেনটিস হয়ে গোপাল বি-ও-এ-টি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। এমন সময় বেধে গেল খান্ত-আন্দোলনের আলোড়ন। চালের দাম উঠলো দু'টাকা কে জি। কারখানার সোকেরা মাইনে পায় দিন দু'টাকা, কি কিনবে আর কি খাবে? বলেঃ খেতে না পেলে কাজ করবো কি করে?

মালিক নিজেই দেখাশুনা করেন, বললেনঃ আমি যদি মাল ন। পাই, তো মাইনে দেবো কোথেকে? আমি সোক কমাতে পার্থ্য হবো।

মজুররা বলেঃ হাটাই করা চলবে না।

মালিক বলেনঃ তা হলে কারখানা বন্ধ করে দেবো। আমি লাকসান দিতে পারবো ন।

গোপাল ফোস করে উঠেঃ কেন, আপনার তো অনেক চাল মজুত আছে, সেই চাল উচিত দামে এদের দিন।

—আমার কোন চাল নেই।

—ধান আছে।

—নেই।

—লুকিয়ে রাখার জন্য আপনার বাগানবাড়ীতে আপনি গোলা করেছেন আমি জানি। আপনার গোলায় ধান ধাকবে আর আপনার কর্মচারীরা খেতে পাবে না, তা হয় না।

মালিক একবার কটমট করে গোপালের পানে তাকালেন, কোন জবাব দিলেন না।

বিকালের দিকে কারখানায় নোটিশ পড়ে গেল—কারখানা সাত দিনের জন্য বন্ধ রইলো। কবে খুলবে তা পরে জানানো হবে।

মজুররা তবু নগদ দু'টাকা দৈনিক পাচ্ছিল, তারা চোখে অঙ্ককার দেখলো, কাজ না হলে তো মাইনে নেই।

গোপাল গেল মালিকের ঘরে, বললোঃ এ আপনি কি করছেন, মাঝুষগুলো যে না খেয়ে মরবে।

মালিক বললেনঃ কাজ নেই, কি হবে ?

—কাজ নেই কি বলছেন ? কাজ তো আমরা শেষ করে উঠতে পারছি না।

—আমার কারখানা, আমি যা ভাল বুঝি করেছি, আমার সঙ্গে তর্ক করো না।

গোপাল বাইরে এসে মজুরদের বললোঃ খাবার জন্য ভেবো না, বাগানে মালিকের মন্ত্র গোলা আছে। সেখানে ধান জমা আছে, নজর রেখো সেই ধান সরে না যায়।

মজুররা বললোঃ আপনি তা হলে এখানে থাকুন।

গোপাল বললোঃ বেশ, তোরা পাহারা দে, আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

গোপাল যে নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে, মালিক তা জানতেন না। রাতে লরী বোঝাই করে ধানটা সরাবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। বাগানের ফটক পার হতেই মজুররা সেই লরী আটকালো। রাত বারোটায় হৈ-চৈ বেধে গেল সে অঞ্চলে। শেষ অবধি ধানের লরী পুলিশ নিয়ে গেল ধানায়। মালিক

গোপালকে বললেন : তোমাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমি
জানি ।

গোপাল বললো : আমিও জানি, গভর্নেন্ট আপনাকে চলিশ
হাজার টাকা দিয়েছে ইস্কুল-বিল্ডিং করতে, তা থেকে দশ হাজার
টাকা দিয়ে আপনি কারখানার ছটো লেদ মেশিন কিনেছেন। চুণ-
শুরকির বদলে ঘেঁষের গাঁথুনি করেছেন, পুরানো জানলা-দরজা
দিয়েছেন, হিসেব দিয়েছেন নতুনের। সে কথা আমি খবরের
কাগজে ছাপিয়ে দেবো ।

—প্রমাণ করতে পার তোমার কথা ?

—একজন ইঞ্জিনিয়ার এনে, স্কুল-বাড়িটি দেখালেই প্রমাণ হয়ে
যাবে। তিনিই হিসেব করে বলে দেবেন, এই রকম বাড়ি করতে কত
টাকা খরচ হয় ।

মালিকের মাথার মধ্যে আগুন জলে উঠলো, বয়সটা কম ধাকলে
এক ধান্ডি মেরে গোপালের দাতের পাটি তিনি উড়িয়ে দিতেন।
এ বয়সে আর সে সাহস হয় না। তা হোক, এই ছোড়াটাকে
তিনি সহজে ছাড়বেন না ।

গোপালকে শায়েস্তা করার জন্য পরদিন সকালেই মালিক
হোমগার্ডের ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠালেন। সব শুনে ক্যাপ্টেন
তরসা দিল, কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, একটু
ভাববার সময় দিন ।

তিনিদিন পরেই একটা ডাকাতি হয়ে গেল মালিকের বাড়িতে।
হোমগার্ডের ক্যাপ্টেনের সাক্ষ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। গোপালকে
আর কারখানার ছজন মজুর-সর্দারকে। গোপালের প্রতিবেশী ও
বন্ধু অমিয় খবর পেয়েই ছুটে এলো ধানায়। পুলিস জামিন দিল
না। অমিয় মহা দৃশ্যস্তায় পড়লো। ভাল একজন উকিলের
সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। অমিয় ছুটলো গোবিন্দ মল্লিকের
কাছে ।

গোবিন্দকে মোটামুটি সব কথা বলে, অমিষ্ব বললো—গোপাল
বলছে সে নির্দোষ, আর আমিও জানি এ কাজ তার দ্বারা সন্তুষ্ট নয়।

গোবিন্দ বললো : বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন কথা নেই। সাক্ষ
প্রমাণের উপর বিচার হবে। আপনি আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের
জবাব দিন—এক, টাকাকড়ি সমেত গোপাল হাতে-নাতে ধরা
পড়েছে কি না ?

—না। কারখানার মালিক বিজয়বাবুর বাগানের সামনে
হরিশবাবুর বাড়ীর দাওয়ার উপর সে ঘুমুচিল, ভোরবেলা তাকে
পুলিশ হুলে নিয়ে গেছে।

—হই, গোপালের কাছে লুঠের টাকাপয়সা কিছু পাওয়া গেছে ?

—কিছুই না।

—তিনি, গোপালের বিরুদ্ধে সাক্ষী একমাত্র হোমগার্ডের
ক্যাপ্টেন, আর কেউ আছে ?

—না।

—রাত্রের অঙ্ককারে হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন গোপালকে চিনলো
কেমন করে ?

—টর্চ লাইট জেসেছিল।

—মুখ দেখতে পেয়েছিল ?

—সে বলে গোপালকে সে ধরেছিল, কিন্তু গায়ের জোকে
পারেনি, গোপাল তাকে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে তার পা মচকে যায়
পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সে এখন বাড়ীতে পড়ে আছে।

—চার, এ সম্পর্কে গোপাল কি বলে ?

—সে বলে সব ব্যাপারটাই সাজানো। বিজয়বাবুর চোরা-
কারবারে বাধা পড়েছে, তাই তিনি গোপালকে জন্ম করার জন্য এই
মামলা সাজিয়েছেন।

—পাঁচ, তা হলে ক্যাপ্টেনের পা ভাঙলো কি করে ?

—গোপাল বলে—ওটাও সাজানো।

ওটা পরৰ কৱে দেখতে হবে, ডাক্তারের রিপোর্ট অতো সহজে
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যাক, কত টাকা লুঠ হয়েছে ?

—দশ হাজার !

—নগদ দশ হাজার টাকা বিজয়বাবু বাড়ীতে রেখেছিল কেন ?

—কারখানার টাকা, মজচুরদের একমাসের মাইনে, ছদিন
আগে ব্যাঙ্ক থেকে বের কৱে এনেছিল।

—সে টাকার একটি পয়সাও তো উদ্ধার হয়নি ?

—না।

ঠিক আছে, আমি এদিকে একটু খোজ খবৱ নিই, মামলার
দিন আপনি আদালতে আমার সঙ্গে দেখা কৱবেন। এ ক'টা
দিন গোপালকে হাজতেই থাকতে হবে।

গোবিন্দ গেল অকুস্তল দেখতে।

কারখানার মালিক বিজয়বাবু বৰ্ধিষ্ঠ ব্যক্তি। পূর্বে তাঁরাই এই
অঞ্চলের জমিদার ছিলেন, দেউড়ি, থাম, বারান্দা ও পাঁচিল-ঘৰো
বাগান পূর্বস্থৱিৰ সাক্ষ্য বহন কৱছে। জমিদারী হারালেও বিজয়-
বাবু আৰ্থিক দুৰ্গতিৰ আশঙ্কায় পড়েননি, কাৰণ তাৰ আগেই বাড়ীৰ
পাশে তিনি কারখানার পন্থন কৱেছিলেন এবং কারখানা ভালই
চলছিল। আগে এই কারখানাটি ছিল বসতিৰ শেষ, এখন এৱ
পিছনে বাস্তুভ্যাগীৱা মন্ত এক বসতি কৱেছে।

গোবিন্দ জমিদারবাড়ীটা আগাগোড়া মুৱে দেখলো। U-ধৰনেৱ
বাড়ী, তিনদিকে পৱপৱ ঘৱ। এই বাড়ীৰ সঙ্গে পৱিচয় না থাকলে,
কোন্ ঘৱে কোন্ মাছুষ থাকে, তা বোঝাৱ উপায় নেই।

চোৱ যদি বাড়ী থেকে টাকাপয়সা নিয়ে বেৱিয়ে আসতে পাৱে
তা হলেও আটকুট একটা পাঁচিল তাকে টপকাতে হবে, তবে সে
পথে আসতে পাৱবে।

গোবিন্দকে দেখে বাড়ীৰ কৰ্তা বেৱিয়ে এলোন, বললেন : আপনি
যে, আপনাকে এ অঞ্চলে নতুন দেখছি।

গোবিন্দ কস করে বলে দিল—আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের স্নোক, আপনার চুরির ব্যাপারটা ‘স্টাডি’ করতে এসেছি।

—লালবাজার থেকে আসছেন ?

গোবিন্দ একটু মাথাটা দোলালো।

—বেশ, বেশ, ভিতরে আসুন, দেখুন।

বিজয় গোবিন্দকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, একেবারে দোতলায়। যে ঘর থেকে টাকাটা চুরি গেছে সে ঘর দেখালেন, বললেন—এর পাশের ঘরেই আমি শুই। রাতে কেমন যেন একটা শব্দ শুনে শুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরে টাকা রয়েছে, ছুটে এলাম। দেখি আলমারী খোলা, জ্বানালাও খোলা। এ বাড়ীর দোতলার জ্বানালায় কোন গরাদ নেই, বুঝলাম টাকা নিয়ে এই জ্বানালা দিয়েই চোর সরেছে। জ্বানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় পাঁচিলের বাইরে একটা গোলমাল শুনলাম। একটা হটোপাটি, সামান্য চীৎকার, তারপরেই সব চুপচাপ। তখনই দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে বাইরে বেরলাম। দেখি, ওদিকে পথে বসে হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন পা ডলছে। চোরকে সে পাঁচিল টপকাতে দেখেছিল। ধরেও ছিল, কিন্তু গায়ের জ্বারে পারেনি, চোর তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। বেচারার পা ভেঙে গেছে। তবে চোরের মুখে একধানা কুমাল বাধা ছিল, সেই কুমালধানা কোন মতে খুলে যায়। সেটা ফেলেই সে পালিয়েছে। সেটা চোরকে সন্তুষ্ট করার একটা বড় প্রমাণ। চোরের নাম লেখা আছে। কুমাল দেখেই তো পুলিশ গোপালকে ধরে।

—হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন চোরকে চিনতে পারেনি ?

—না, পিছন দিক থেকে সে ধরেছিল, মুখ দেখতে পায়নি, তবে মাছুষটির যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়।

—আলমারীতে আড়ুলের কোন ছাপ কি দেখা গিয়েছিল ?

—ছাপ পাবেন কোথা ? আলমারী খোলা দেখে আমি কে

আলমারী বন্ধ করি, যদি কোন ছাপ থেকে থাকে, তার উপর আমার হাত পড়েছে। গোবিন্দ ব্যাপারটা বুবল।

হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন ভোলাবাবু পড়ে আছে হাসপাতালে। গোড়ালির যেখানে চোট লেগেছে, সেখানে এক্স-রে হবে।

ভোলানাথ চোখালো যুবক, এ অঞ্চলে ‘মস্তান’ বলে তার খ্যাতি আছে। গোবিন্দের পরিচয় পেষে সে বললো—গোপালকে যদি আদালত থেকে ছেড়েও দেয়, আমি ওর ঠ্যাং থোঁড়া করে দেবো। আমি সহজে ছাড়বো না। আইনের ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ফাঁক নেই, আমি ভাঙ্গা পায়ের শোধ তুলবোই।

—তুমি তো তার মুখ দেখতে পাও নি? .

—চেহারা দেখেছি, পোশাক চিনেছি, রুমাল কেড়ে নিয়েছি, রুমালে তার নাম লেখা আছে।

—পুরো নাম আছে?

—হ্যাঁ, বাংলায় পুরো নাম লেখা আছে। অতো সহজে সে আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারতো না। একথানা ইটে আমি ঠোকর থেয়ে পড়ে গেলাম বলেই তার স্মৃবিধে হলো।

—তাহলে ইটে পা ভেঙেছে—গোপাল ভাঙেনি?

—হ্যাঁ, ও আমার পা ভাঙবে। ইটখানায় ঠোকর না খেলে আমি বুঝিষ্ঠে দিতাম।

এই আক্রোশশূক্রুর বেশি আর কিছু ভোলার শোনা গেল না।

গোবিন্দ ধানায় গেল। দারোগাবাবু অসম্ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করলো না। আসামী পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টার সব সময় মামলা ভঙ্গ করতে আসে। এদের জন্য আদালতে পুলিশকে বড় বেগ পেতে হয়। যে মামুষ নিশ্চিত অপরাধী—এরা আইনের ফাঁক দিয়ে তাকে বের করে নিতে চায়। এই উকিলগুলো না থাকলে পুলিশের কাজ অনেক সহজ হতো, চুরি-ডাকাতি লোপ পেতো দেশ থেকে।

দারোগা বললো, ‘আপনি কি চান বলুন, আমার সময় খুব অল্প।’

গোবিন্দ বললো, ‘একটা কথা জানতে এলাম, চোরাই টাকাটার
কেম সঙ্কান আপনারা পেয়েছেন ?’

—না ।

—গোপালের ঘর সার্চ করেছিলেন ?

—হ্যাঁ, এখানকার ঘর ও কলকাতার বাড়ী, তই দেখেছি। ও
টাকাটা অন্ত হাতে সরিয়ে দিয়েছে। তা সে যেখানেই রাখুক,
আমাদের কাছে ধরা পড়বেই ।

—নোটের নম্বর রেখেছেন ?

—ব্যাক্ষ থেকে আনা দশ-পাঁচ টাকার পুরানো নোট, তার আর
নম্বর কোথায় পাবো ?

—তা হলে সে নোট যদি কেউ বাজারে ভাঙায়, ধরবেন কি
করে ?

—ঠিক ধরবো, সে আপনি তখন দেখবেন ।

এর পর আর কথা চলে না, গোবিন্দকে উঠতে হলো ।

গোবিন্দ গেল হাজতে। গোপালকে বললো : সাঙ্গীসাবুদ
প্রমাণ সবই তোমার বিপক্ষে, জেল থেকে তোমাকে বের করে আনা
আমার দ্বারা সন্তুষ্ট হবে কি না, কে জানে ।

গোপাল বললো : আমি কিন্তু সত্য বলছি উকিলবাবু, আমি
এর কিছুই জানি না ।

—কিছু না জানলে তোমার কুমালখানা সেই রাত্রে ভোলাবাবুর
হাতে গেল কি করে ?

—কুমালখানার কথা আমি জানি। ওটা সেই রাতে ভোলা-
নাথের হাতে যায় নি, গেছে তার আগে সঙ্কোবেলা। বিকালে
আমি মজুরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম তখন ভোলা-
নাথ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টে, সেখানে আমরা
হজনে চা-বিস্কুট খাই। ভোলানাথ আমাকে সাবধান করে দেয়
যে আমরা যাই করি, কোন হাঙ্গামা না বাধে, তা হলে সে আমাকে

গ্রেপ্তার করাতে বাধ্য হবে। পরে আমি বাড়ী গিয়ে দেখি পকেটে
কুমালখানা নেই। রেস্টুরেন্টেই আমার কুমালখানা খোয়া যাব।

—তুমি বলতে চাও ভোলানাথ এই কুমাল পিকপকেট করে এই
মামলা সাজিয়েছে? আদালতে এই কথা বোঝাতে পারবে।

—আদালত যদি না শোনে তো সে আমার অদৃষ্ট। ছেলে-
বেলায় বাপ-মা মরেছে, জাতিরা সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়েছে, আমার
হংখের অদৃষ্ট, আমাকে হংখ পেতেই হবে। দোষ না করেও জেল
ধাটতে হবে।

গোপালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোবিন্দ দেখু করলো
অমিয়র সঙ্গে। বললোঃ একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।
ক্যাপ্টেন ভোলানাথ পড়ে আছে হাসপাতালে। শুধুকার নার্স
বা বয়কে হাত করে নজর রাখতে হবে বিজয়বাবু ওর সঙ্গে দেখা
করতে আসেন কি না, এবং আর কে কে আসে, কি কি কথা হয়।
যথাযথ রিপোর্ট চাই। আমি খবর পেয়েছি ভোলানাথ বিজয়বাবুর
লোক, বিজয়বাবুর সুপারিশেই ভোলানাথ হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন
হয়েছে। এই ভোলানাথই গোপালের বিকল্পে প্রথান সাক্ষী, এবং
এই ভোলানাথই গোপালের কুমাল দিয়েছে পুলিশের হাতে।
গোপালের কথামত ব্যাপারটা যদি সত্য সাজানো হয় তা হলে
ভোলানাথই এই ব্যাপারে প্রথান নায়ক। ভোলানাথের উপর
একটু নজর রাখলেই ব্যাপারটার একটা মুক্ত পাওয়া যেতে পারে।

অমিয় বললোঃ বেশ, এখনি আমি হাসপাতালের কোন
লোককে বকশিস দিয়ে হাত করচি।

হাসপাতালে কিন্তু নজর রাখার বিশেষ দরকার হলো না, পর-
দিনই ভোলানাথকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল। বিজয়বাবু
নিজের মোটরে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন বাড়ীতে।

অমিয় খবর দিলে, গোবিন্দ বললোঃ এবার বাড়ীতে নজর
রাখুন, বিজয়বাবুর আনাগোনার খবর যেন পাই।

অমিয় খবর দেয়—বিজয়বাবু রোজ ত্রু-বেসা আসেন, এসে প্রথম কথাই তিনি বললেন : ‘কি হলো কবে দেবে ?’ ভোলানাথ কি বলে ঘরের বাইরে থেকে তা শোনা যায় না ।

গোবিন্দ বলে : ঠিক আছে, নজর রেখে যান ।

নজর রাখতে রাখতে মামলার দিন এগিয়ে এসো । মামলাটোকে জটিলতা ছিল না । পুলিশ এমন কোন প্রমাণ দিতে পারলো না, যাতে গোপালকে যথার্থ অপরাধী বলে ধরা যায় । ভোলানাথ পলায়মান চোরের মুখ দেখেনি, আর শুধু একখানি ঝুমাল ।

গোবিন্দ বললো : ঝুমালখানা এমন কোন প্রমাণ দেয় না যে ঝুমালের মালিকই চোর ।

ম্যাজিস্ট্রেট গোবিন্দের কথা মেনে নিলেন, মামলা টিকলো না, গোপাল খালাস পেল ।

মজুররা গোপালকে নিয়ে গেল কারখানার মাঠে, ফুলের মালা দিল, বললো : আপনাকে জব্দ করতে চেয়েছিল, আমরা জানি এসব মালিকের সাজানো ব্যাপার ।

সেখান থেকে স্টেশনে পৌছতে গোপালের দেরী হয়ে গেল ।

ঠিক সেই সময় প্ল্যাটফর্মের উপর একটা গোলমাল উঠলো । একটা লোকের হাত থেকে একটা সুটকেশ ছিনিয়ে নিয়ে একটা লোক প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আসছে । মুখোমুখি আসতেই অমিয় লোকটিকে চেপে ধরলো ।

—আরে এ যে বিজয়বাবু !

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলো : কি ব্যাপার বিজয়বাবু ?

—ব্যাটা ঠিক, চোর—রাগে বিজয়বাবু কাঁপতে সাগলেন—আমার টাকা নিয়ে বেনারসে পালাচ্ছে, ঠিক সময় এসে পড়েছি ।

ভোলানাথ পিছন থেকে খোঢ়াতে খোঢ়াতে এগিয়ে এলো, বললো : দিন, আমার সুটকেশ দিন ।

বিজয়বাবু বললেন : আমার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে যাও ।

ভোলা বললোঃ একদফা তো বুঝিয়ে দিয়েছি, বাকিটা ফিরে
এসে বোঝাব।

—আমার টাকা না বুঝে পেলে আমি তোমায় কোথাও যেতে
দেবো না।

—আপনার এতো টাকা তবু সামাজ্ঞ কয়েকটা টাকার জন্য
আপনি আমার টিকিটখানা নষ্ট করবেন?

—সামাজ্ঞ টাকা! তুমি চল—

ভোলানাথ অমিয়, গোপাল ও গোবিন্দের পানে তাকিয়ে
বললোঃ আমি কোথাও যাবো না, এই ট্রেনে আমি বেনারস
যাচ্ছি। আপনি আমার স্মৃটকেশ দিন!

—দিচ্ছি, বলে বিজয়বাবু ছিটকে পড়লেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে গোবিন্দ তাঁর হাত থেকে স্মৃটকেশটা ছিনিয়ে
নিলে, বললোঃ এটা আমি একবার খুলে দেখতে চাই।

বিজয়বাবু রুখে দাঢ়ালেন, বললেনঃ কে আপনি?

—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, লালবাজার। আপনারা তু-জনেই
আমার সঙ্গে আসুন।

স্মৃটকেশ হাতে নিয়ে হনহন করে গোবিন্দ গেল স্টেশন-
মাস্টারের ঘরে। ভোলানাথের কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্মৃটকেশ
খোলা হলো। ছোট স্মৃটকেশ, তু-চারখানা কাপড়ের নীচেই পাওয়া
গেল তাড়া করা দশ টাকা ও পাঁচ টাকার নোট।

গোবিন্দ বললোঃ এইটেই আমি আশা করেছিলাম। ভোলা-
বাবু, এতে কি দশ হাজারই আছে, না কিছু খরচ করেছ?

ভোলা শুকনো মুখে বললোঃ দশ হাজার আছে।

গোবিন্দ বললোঃ থাক, এবার আমরা বিজয়বাবুর নামে
পাণ্টা মামলা করবো, ষড়যন্ত্র করে চোর সাজিয়ে হয়রানি করা,
গোপাল এবার ভালমতো একটা খেসারত পাবে।

বিজয়বাবুর মুখ্যানা চুপসে গেল।

গোয়েন্দা দে ও গোয়েন্দা দী
হিমানীশ গোস্বামী

গোয়েন্দা দে ঘরে বসেছিলেন, এমন সময় গোয়েন্দা দী এসে চটপট চেয়ারে বসে পড়লেন। বহুদিন কোনোরকম কেস হাতে না থাকায় গোয়েন্দা দে ভাবছিলেন গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বিড়ি তৈরী করা শিখবেন কিনা। আরও ভাবছিলেন গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা একেবারে ছেড়ে না দিয়েও বসে বসে বিড়ি পাকানো যায়—তাতে যে সময়টা বসে থাকতে হয় সে সময়টা অন্তত একটা খাভজনক কাজে লাগানো যায়। না, সত্যিই গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটাই দেশ থেকে যেন উঠে যাচ্ছে। তেমনি রহস্যজনক খুন্টুনও আজকাল হচ্ছে না। হলেও খুনীরা নেহাণ বোকার মতই সটান ধানায় গিয়ে হাজির হচ্ছে আর অপরাধ স্বীকার করছে। পুলিশও মহা খুশি হয়ে তাদের চালান করে দিচ্ছে আদালতে। অথচ এই কয়েক বছর আগেও বেশ ভাল ভাল খুন্ট হত।

চাণক্য চাকলাদারের মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল পাকুই-পুকুরের ছুটো তাল গাছের মাধ্যায়, তখন লোকে সেটাকে সাধারণ একটা হত্যাকাণ্ড বলেই ধরে নিয়েছিল, তিনি যে আত্মহত্যা করেছিলেন তা প্রথমে কেউই অনুমান করতে পারেনি। চাণক্য চাকলাদার ছিলেন নাম করা ধনী। তিনি একটু রহস্যময় ব্যক্তি ছিলেন; তাঁকে নানা অনুত্ত অনুত্ত স্থানে দেখতে পাওয়া যেত। অতএব তাঁর মৃতদেহ ছুটি তাঙ্গাছের মাধ্যায় পাওয়া যেতে লোকেরা বিশেষ আশ্চর্য হয়েনি। অবশ্য তাঁকে যদি একটা তাল-গাছের মাধ্যায় পাওয়া যেত তাহলে কেউই হ্রস্ত ব্যাপারটা নিয়ে

বশি মাথা ঘামাত না। কিন্তু হৃ-হৃটো তালগাছের মাথা নিয়েই হল একটু মুশকিল। একটি গাছে ছিল তাঁর মাথা, অন্তিতে ধড়। কিন্তু নামিয়ে আনবার পর, যারা নামিয়ে এনেছিল তাদের মধ্যে বিরাট এক বিভাস্তির শষ্ঠি হয়েছিল। তারা একেবারে গুলিয়ে ফেলেছিল চাণক্যবাবুর মাথা কোন গাছে ছিল, আর ধড়ই বা কোন গাছে ছিল। এই রহস্যের সমাধান করা যে সে লোকের কর্ম ছিল না।

তখন যদি গোয়েন্দা দে-র শরণ না নিত পুলিশ, তাহলে পুলিশের পক্ষেও বলা সম্ভব ছিল না, চাণক্যবাবু কোন তালে ছিলেন। তা ছাড়া পুলিশের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, কিন্তু গোয়েন্দা দে প্রমাণ করে দেন তা নয়, এটা স্বেক্ষ আভ্যন্তর ব্যাপার।

কি ভাবে গোয়েন্দা দে চাণক্যবাবুর এই মৃত্যুকে আভ্যন্তর বলে প্রমাণ করেছিলেন তা এখানে বলা সম্ভব নয়। তা নিয়ে বহুরকম আলোচনা গত কয়েক বছর ধরে হয়ে গেছে। তিনখানা বইও এই বিষয়ে লেখা হয়েছে। নানা বিদেশী পুলিশও তখন এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয়েছিল। পৃথিবীময় এ নিয়ে হৈ চৈ না পড়ে গেলেও নানারকম আলোচনা যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ মেই। সে সব কথা অনেকেরই নিশ্চয় এখনো মনে আছে, অতএব এখানে তার উল্লেখ করলাম না।

গোয়েন্দা দে গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে দিয়ে বিড়ি পাকানোর কথা ভাবছেন, কিংবা গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে না দিয়েও বিড়ি পাকানো যায় কিনা ভাবছেন, এমন সময় গোয়েন্দা দাঁ-এর প্রবেশ। তিনি বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তারপর বললেন—আর পারা যাচ্ছে না মশাই। গোয়েন্দা হয়ে আর বেঁচে থাকা যাচ্ছে না—একটা অন্ত কিছু করা দরকার বুঝলেন। ভাবছিলাম আমরা যদি দুজনে মিলে বিড়ি তৈরী করি তো কেমন হয়?

বিড়ি তৈরির কথা শুনে গোয়েন্দা দে আয় আতকে উঠলেন ।।
বললেন—দাদা আমিও যে সকাল থেকে ঐ কথাই ভাবছি ।।
আর উপায় নেই, বড় বড় লোকেরা আজকাল আর তেমন খুন
হচ্ছেন না, এটা একটা বিশেষ ভাবনার কথা । কিন্তু বহু বড় বড়
লোক আজকাল সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছেন । গোয়েন্দাগিরির
ভবিষ্যৎ অঙ্ককার, কিন্তু বিড়ির মার নেই । আচ্ছা দাদা আপনি
কেমন করে এই বিড়ি তৈরির সিদ্ধান্তে এসেছেন বলবেন ?

তখন গোয়েন্দা দাদা বললেন—খুব সহজেই । আমি দেখলাম
মাঝমেরা তেমন রহস্য সৃষ্টি করছে না । কেউ খুন হচ্ছেন না, কেউ
নিরঞ্জনেশ হচ্ছে না, কেউ প্রচুর টাকার সোনা হীরা বা জহরত চুরি
করছে না, অথচ যখন দেখছি লোকেরা কিছু না কিছু টানছেই,
হয় সিগারেট, নম বিড়ি, নয় ইঁকো, নয় গাঁজা ; অতএব তেবে
দেখলাম..... ।

বলতে না বলতে কলিং বেলটা বেজে উঠল । আর দরজা খুলে
প্রবেশ করলেন একজন মহিলা । বললেন, গোয়েন্দা দে ! উঃ !
গোয়েন্দা দে—অন্তু একটা রহস্য ঘটে গেছে ।

রহস্যের নাম শুনে গোয়েন্দা দে আর গোয়েন্দা দাদা বেশ
উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসলেন ।

মহিলাটি বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে !

সর্বনাশ হয়ে গেছে শুনে গোয়েন্দা দে একটু যেন মিহ়িয়ে
গেলেন । লোকেরা আগে থেকেই যদি কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত
করে বসে তাহলে আর তাঁর করবার রইল কি ? গোয়েন্দা দাদা-ও
একটু যেন খান হয়ে গেলেন । তারপর সামলে নিয়ে বললেন,
আপনার সর্বনাশ হয়ে গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে ! আমার দেড়লাখ
টাকা দামের হীরে আর জহরত বসানো একটা নেকলেস অস্তর্ধান
করেছে ।

গোয়েন্দা দে বললেন, কি সাংঘাতিক ! কি সাংঘাতিক ! মনে থানে কিঞ্চিৎ ভাবলেন, বেশ হয়েছে। ধনী মহিলাদের এরকম ‘সর্বনাশ’ না হলে গোয়েন্দাগিরির যে সর্বনাশ হয় ! শাস্তিভাবে তিনি বললেন—তা ঘটনাটা কি ঘটেছে আপনি বলবেন কি ? অবশ্য তার আগে আমার ফী এর কথাটা বলে নেওয়া ভাল। আমাকে আপাতত হাজার পঁচাচেক টাকা দেবেন খরচা বাবদ, আর তারপর যেমন খরচ হয় তেমন হিসেব দেব। পাঁচ হাজার টাকা ফুরিয়ে গেলে আবার পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। এইভাবে চলবে। তারপর নেকলেসটা পাওয়া গেলে দশ হাজার টাকা চাই। এতে রাজি আছেন তো ?

গোয়েন্দা দাঁ তো গোয়েন্দা দের কথায় একেবারে হাঁ। আজকাল কেউ দশ পঁচিশ টাকার বেশি দিতে চায় না—আর দে কিনা একেবারে প্রথমেই পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে !

মহিলাটি বললেন—না মশাই, আমি রাজি নই।

—বেশ তো, গোয়েন্দা দে বললেন, বেশ তো আপনি রাজি করতে বলুন। নির্ভয়ে বলুন। পাঁচ হাজার হয়ত দিতে পারছেন না আপাতত—তা বলে পাঁচশো টাকা নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি হবে না ? নিদেন পক্ষে শ খানেক ?

তাতেও মহিলাটি চুপ করে থাকাতে গোয়েন্দা দে বললেন, তা শ খানেক টাকা হয়ত আপনার কাছে নেই, গোটা দশেক টাকা নিশ্চয় নিয়ে বেরিয়েছেন ?

মহিলাটি বললেন, আপনি ব্যাপারটাই ধরতে পারেননি। আমার আরো একটা সর্বনাশ হয়েছে, বলা হয়নি।

—আরো সর্বনাশ হয়েছে ? গোয়েন্দা দে নড়ে চড়ে বসলেন, আর গোয়েন্দা দাঁ একেবাবে চুপ করে রইলেন, যেন পাথর !

মহিলাটি বললেন, অবশ্য অন্ত সুর্বনাশটি তেমন মারাত্মক নয়—যেমন ধরন আমার স্বামী……। .

গোয়েন্দা দাঁ হঠাতে পাথর অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন।
তিনি বলে উঠলেন, আপনার স্বামী খতম হয়েছেন কি? বলুন,
বলুন, নির্ভয়ে বলুন। আপনি আমার কাছে সব কথাই বলো
পারেন। আমিও একজন গোয়েন্দা কিনা—আমার নামও হয়
শুনে থাকবেন। পাঁচ বছর আগে সেই যে শুভনগরের মহারাজা
প্রিয় কচ্ছ চুনকালি নিরুদ্দেশ হয়েছিল, সেটা নিয়ে পৃথিবীমধ্যে
হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, সে রহস্যের সমাধান কে করেছিল জানেন?

মহি঳াটি বললেন, আপনি...আ...প...নি...গোয়েন্দা দাঁ, তা
একক্ষণ বলেননি কেন? আমি তো আমার সর্বনাশ হবার পরই
প্রথমে হস্তদণ্ড হয়ে আপনার বাড়ীতেই গিয়েছি। আপনাকে ন
পেয়েই তো...। তারপর গোয়েন্দা দে-র দিকে তাকিয়ে বললেন
তা বলে আপনাকে গোয়েন্দা হিসেবে আমার খুবই পছন্দসই
তা গোয়েন্দা দাঁ-এর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছেই কিনা, তা
ওঁর কাছে যাওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তা আমি বলি কি
আপনারা ছুঁজনেই আমার কেসটা নিন না। রহস্য তো একট
নয়—ছুঁটো। প্রথম রহস্য আমার হীরে জহরতের নেকলেসের
অস্তর্ধান। দ্বিতীয় রহস্য হচ্ছে, আমার স্বামী পশুপতিরাম বস্তু
নিরুদ্দেশ হওয়া.....।

—পশুপতিরাম বস্তু? বিশ্বিত হয়ে গোয়েন্দা দে প্রশ্ন করেন
পশুপতিরাম বস্তু তো একজন নামকরা বিড়ি প্রস্তুতকারক? তা
তিনি তো প্রায় দিন দশেক হল নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

মহি঳াটি বললেন, ওটা তেমন কিছু সমস্যা নয়। স্বামী
নিরুদ্দেশ হয়েছেন, হয় ফিরবেন নয় ফিরবেন না, এরকম তো কতই
হয়, কিন্তু আমার নেকলেসটি...।

গোয়েন্দা দে এবং গোয়েন্দা দাঁ বললেন, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি
ঐ নেকলেসটি আমরা সন্তুষ্ট ঘট্টা তেতালিশ মিনিটের ভেতর খুঁতে
বার করবই করব।

ମହିଳାଟି ଏକଥାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ଉଠିଲେନ । ନା—ନା—ନା,
ଦ୍ୱାହାଇ ଆପନାଦେର, ତା କରବେନ ନା ।

ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ଦେ ବଲିଲେନ, ଆଜ୍ଞା ତାହଲେ ଆମରା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚୌଷଟି
ଟିକ୍ଟା ଏଗାରୋ ମିନିଟେର ମଧ୍ୟେ ବାର କରତେ ହସ୍ତ ପାରି, ଅବଶ୍ୟ
୍ୟଦି ଠିକ ମତ ଏକଟା ହେଲିକପ୍ଟାର ପାଉୟା ଯାଯା । ମୋଟକଥା,
ଆପନାର ନେକଲେସ ସମ୍ପର୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାକତେ ପାରେନ । ତବେ ଅଗ୍ରିମ
ହିସେବେ... ।

୯ ମହିଳାଟି ବଲିଲେନ, ଆପନାରା ବୁଝତେ ପାରଛେନ ନା । ନେକଲେସଟି
ଖୁଜେ ପେଲେ ଆମାର ସର୍ବନାଶ ହବେ । ପୁଲିଶ ଯେ ଭାବେ ଏହି ନେକଲେସଟି
ଖୁଜେ ବାର କରବାର ତାଲେ ଆହେ ଯେ, ଯେକୋନ ଯୁହୁରେ ତାରା ଛାତେ
ଉଠିବେ; ଆର ଉଠିଇ ହସ୍ତ ଶୂରୁଥି ଫୁଲେର ଟବଟା ଖୁଜେ ଦେଖିବେ
ଆର ତାହଲେଇ ସର୍ବନାଶ ହବେ । ଏକଟା ପୁଲିଶ ତୋ ବାଡ଼ିତେ ଏସେଇ
ଛାତେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକେ । ଓଟାର ମନେ କି ଆହେ କେ ଜାନେ ?

ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ଦୀ ବଲିଲେନ, ପୁଲିଶେର ମନେ କି ଥାକେ ନା ବଲୁନ ?
ଅନେକ କିଛୁଟି ଥାକେ । କିନ୍ତୁ ଆପନି ଯଦି ଆନେନଇ ଛାତେର ଶୂରୁଥି
ଫୁଲେର ଟବେ ଆପନାର ନେକଲେସ ରଙ୍ଗେହେ ତାହଲେ ଆପନି ପୁଲିଶେ
ଥିବର ଦିରେଛେନ କେନ ?

ମହିଳାଟି ବଲିଲେନ, ଐ ତୋ ଦସ୍ତର । ପୁଲିଶେ ଥିବର ଦିତେଇ ହବେ
ନଇଲେ ଇଲ୍‌ମିଓରେନ୍ ଥେକେ ଟାକା ଦେଇ ନା । ଏର ଆଗେ ଏକବାର
ଆମାଦେର ଆରୋ ସର୍ବନାଶ ହରେଛି—ପ୍ରଚାନ୍ତର ହାଜାର ଟାକା ଦାମେର
ଏକଟା ହୀରେ ହାରିଯେଛିଲ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରେ ପୁଲିଶେଇ ଥିବର ଦେଉୟା
ହସ୍ତନି, ତାଇ ସେବାରେ ଖୁବ ଜୁଦ ହରେଛିଲାମ । ଏବାରେ ତାଇ ନେକଲେସ
ହାରିଯେ ଯାବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିଶକେ ଥିବର ଦିଯେ ଦେଉୟା ହସେହେ ।

ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ଦେ' ଏବାରେ ଏକଟୁ ହତଭୟ ହୁୟେ ବଲିଲେନ, ତା ନେକଲେସଟି
ଏତା ସତି ହାରାଯାନି । ତାହଲେ ପୁଲିଶକେ ଡେକେଛେନ କେନ ?

ମହିଳାଟି ବଲିଲେନ, ଆସନ୍ତ ବ୍ୟାପାର ତାହଲେ ଶୁଭୁନ । ଆମାର
ସ୍ଵାମୀ ଏକଜ୍ଞ ସାମାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀ । ମାସେ ତା'ର ଆଜ୍ଞା ଦଶ ବାରୋ

হাজার টাকা ও হয় কিনা সন্দেহ। আপনারা জানেন আজকালকাবু
বাজারের অবস্থা। এই দশ হাজারে সংসার ভালভাবে চলে না।
কেননা আলুর দাম বেড়েছে, লঙ্কার দাম বেড়েছে, এমন কি সামাজিক
পেঁয়াজ, রশুন তাদেরও দাম বেড়েছে। অতএব উপরির ব্যবস্থা
করতে হয়। তা বিড়ির ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে যদি গোয়েন্দাগিরি
করা যায় তাহলে কিছু উপরি আয় হতে পারে, এইটে ভেবে তিনি
গোয়েন্দাগিরি করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি
করতে গেলে একটি অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হয়।
তাই তিনি গোপনে আমার ইন্সিগ্নিয়েন্স করা নেকলেসটি বোঝা
দিয়েছেন দেড়লাখ টাকা দিয়ে। একটি জাল নেকলেস তৈরী
করিয়ে ফুলের টবে রেখে দিয়েছেন। একদিন আমি প্রচার করে
দিয়েছি রাত্রে চোর এসে নেকলেসটি চুরি করে নিয়ে গেছে
পুলিশ এসে খুব খোজাখুজি করছে। এখন যদি নেকলেসটা পাওয়া
যায় তাহলে প্রমাণ হবে ওটা জাল নেকলেস, আর তাতে কেলেঙ্গায়ি
কাও ঘটবে। ইন্সিগ্নিয়েন্স কোম্পানী টাকা দেবে না।

গোয়েন্দা দ্বা বললেন, তা আপনার স্বামী কোথাও নিরুদ্ধে
হয়েছেন? মহিলাটি বললেন, তিনি নিরুদ্ধে হননি ঠিক।
নেকলেস চুরি যাবার আগের দিন রাত্রে তিনি পাগল সেঙে, নাম
ভাড়িয়ে পুলিশের হেফাজতে আছেন। অ্যাজিবাই-এর জন্য করা
হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশদের খুব কাছাকাছি থেকে পুলিশদের
খুব স্টাডি করছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন। অর্থাৎ
নেকলেস চুরির ব্যাপারে তাঁকে কেউ দোষী করতে পারবে না,
কেননা তিনি নিরুদ্ধে হবার পরদিনও ঐ নেকলেসটিকে আমার
গলায় দেখেছে এমন বল শোক সাজ্জী দেবে। আর তিনি নিরুদ্ধে
হবার দিন থেকেই পুলিশের হেফাজতে। অতএব তাঁকে কেউ
নেকলেস চোর বলতে পারবে না। এখন আমার সমস্যা হচ্ছে

কমন করে পুলিশকে বিশ্বাস করানো যায় যে নেকলেস যেখানেই
প্রাকৃক চাতে নেট?

গোয়েন্দা দে বললেন, সমস্তাটা খুব গভীর। খুবই গভীর।
এচুর চিন্তার প্রয়োজন। চিন্তা করতে গেলে বেশ কিছু অগ্রিম
প্রয়োজন—এই ধরন শ পাঁচেক টাকা? বেশিও দিতে পারেন—
ফকনন। চিন্তা ব্যাপারটাই এমন যে যত বেশি টাকা দেবেন তত বেশি
ক্ষমতা বেড়ে যায়। দেখেননি আপনি ডাক্তাদের—কাউকে
মাপনি দেন দু-টাকা, কাউকে চৌমটি টাকা, তার মানেই হল বেশি
চূর্বার জন্য আপনি বেশি টাকা দিয়ে থাকেন। আমাদের যা
দেবেন সেই ভাবেই কাজ হবে। ভদ্রমহিলা পাঁচশো টাকা বার
ক্ষেত্রে দিলেন। তারপর ঠিকানা দিলেন। গোয়েন্দা দে বললেন,
আমরা দুজনেই আপনার ব্যাপারে সাহায্য করব। মহিলাটি
গৃহবাদ দিয়ে প্রস্তাব করলেন।

মহিলাটি চলে যাবার পর গোয়েন্দা দে বললেন, মহিলাটিকে
গ্রাহায্য করা দরকাব। কিন্তু পুলিশকে কিভাবে বিভাস্ত করা যায়
চাবছি। আজকাল তো পুলিশ মহলে আমাদের তো তেমন
গাতির নেই। সাহেবরা যতদিন ছিল এদেশে তারা গুণীদের
শ্বান করত। আমাদের সঙ্গে কত বিষয়ে পরামর্শ করত, রীতিমত
গাতির করত। ভারতবর্ষের যে কোন থানা ছিল আমাদের
অবারিত দ্বার। যে কোন হাজতে আমাদের স্থান ছিল বাঁধা।
আর আজ?

। দুজনেই বড় বড় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর ভাবতে
মাগলেন। অনেকক্ষণ ভেবে গোয়েন্দা দে বললেন—একটা কাজ
করা যায়—যদি আমরা ঐ বাড়ীতে গিয়ে জাল নেকলেস সমেত
ক্ষেত্রে টবটিকে চুরি করি তাহলেই চুকে যায়। তাহলে আব
পুলিশের সাধ্য নেট নেকলেসটিকে খুজে বার করা।

। গোয়েন্দা দো বললেন, বেশ, বেশ, ভাল। আহা, খাসা

মতলব ! খাসা মতলব ! আপনার সঙ্গে আমি থাকায় ভালই হয়েছে। আমি একা থাকলে হার চুরির কথাটা ভাবতে পারতাম না।

—তা চুরি কেমন করে করা যায় ?

—কেন, পাইপ বেয়ে উঠে।

গোয়েন্দা দে বললেন, পাইপ বেয়ে উঠবার অনেক অসুবিধে আছে। একটা কিছু কৌশল বার করতে হবে। চলুন একটু বাসে করে বেড়িয়ে আসি। তার আগে দুজনে একটু পরামর্শ করলেন, ফিস ফিস করে।

দুজনে বাড়ি থেকে বেরুলেন। তারপর একটা ভৌড় বাসে কোনমতে উঠে পড়লেন। পরামর্শ মত গোয়েন্দা দে রইলেন বাসের দরজার কাছাকাছি আর গোয়েন্দা দুই চলে গেলেন ভেতরে। তারপর দুজনে টেঁচিয়ে কথাবার্তা হতে লাগল :

—এই যে দাদা, কোথায় চলেছেন ?

—এই তো ভাই চলেছি একটু কারখানার দিকে।

—বাড়িতে কে রয়েছেন ?

—বাড়িতে—বাড়িতে থাকবার মত কেউ নেই। কেবল কয়েক কে. জি. সোনা রয়েছে।

—সোনা ?

—আরে হ্যাঁ সোনা। আজকাল ব্যাকে তো সোনা রাখা যায় না, তাই বাড়িতেই রাখি। ছাতের ওপর ফুলের টব রয়েছে তারই একটাতে রেখেছি।

—আপনি তো আগের ঠিকানাতেই রয়েছেন ?

—হ্যাঁ, আগের ঠিকানাতেই—আঠারোর ছই-এর পাঁচ, পাঁচকড়ি সামন্ত সেন, আলিপুর।

তারপর দুজনে নামলেন বাস থেকে, কিন্তু দুজনে দু-জামগায়

তারপর নির্দিষ্ট এক জায়গায় দুজনে হাসতে বললেন, বাসের মধ্যে অতগুলো লোকের মধ্যে একটা না একটা চোর থাকবেই। তাকে বলা হল সোনার তাল রয়েছে একটা বাড়ীতে যেখানে বিশেষ কেউ নেই, এবং বাড়ীর ঠিকানাটা ও জানিয়ে দেওয়া হল।

তবু রিস্ক নিয়ে লাভ কি। আরো কোথাও ব্যাপারটা চালু করা দরকার।

এই বলে দুজনে সারা কালকাতা সুরে বেড়ালেন, বাসে, ট্রামে আর দু-একবার উঠলেন গিয়ে ভৌড় ট্রেনেও।

পরদিন সকালে তো ঝাঁদের চোখ চড়কগাছেই উঠল। খবরের কাগজে প্রথমেই পড়লেন, পুলিশ কর্তৃক পাঁচ শতাধিক চোর ধূত। তারপর জানা গেল ব্যাপারটা :

“পশ্চিমতাম বস্তুর বাড়ীতে গতকাল পাঁচ শতাধিক চোর হানা দেয়। অথচ এটিকে ঠিক পূর্ব পরিকল্পিত ব্যাপার বলা যায় না। ঐ বাড়ীর কাছাকাছি ছদ্মবেশে কিছু পুলিশ পাহারা ছিল। তাহারা প্রথমে কয়েকজন চোরকে ধরে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা একা সামলাইতে না পারায় পুলিশবাহিনীর তলব পড়ে। সকলেই ধরা পড়ে নাই—অনেকেই পালাইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যাহারা পালাইয়াছে তাহারা আর কিছু নেয় নাই, কেবল কয়েকটি ফুলের টব লইয়া গিয়াছে। এমন অন্তুত হামলার কথা কলিকাতা শহরে কেন পৃথিবীতে কোথাও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।”

ক্রিং ক্রিং ক্রিং। গোয়েন্দা দে এবং দী একই সঙ্গে ছিলেন। কোন ধরলেন গোয়েন্দা দে। হালো। ও সমস্ত টবই উধাও হয়েছে? ভালই হয়েছে—এবারে খুশি তো? আমাদের প্রাপ্য দশ হাজার আজই পাঠিয়ে দিচ্ছেন? ভালই তো ভালই তো।

আপনার স্বামীও আজ কিরে 'আসবেন ?' বাঃ, ভাল কথা । হাঁ ;
গোয়েন্দা দাঁকে আপনার দেওয়া ধন্তবাদ পাঠিয়ে দিচ্ছি—কি
বললেন, ওর বাড়ীতে ফোন করে জেনেছেন উনি কাল থেকে
নিরুদ্দেশ হয়েছেন ? গোয়েন্দা দাঁ ? ঘাবড়াবার কারণ নেই—উনি
বহাল ভবিয়তেই আছেন । এই এইখানেই রয়েছেন ? আচ্ছা
রেখে দিচ্ছি ।

রিসিভার রেখে দিলেন গোয়েন্দা দে । বললেন, গোয়েন্দাগিরি
ব্যবসায়ে দেখছি একেবারে ক্ষতি হয় তা নয় । তবে এক্ষেত্রে
যাকে ধরে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল, তাকেই বাঁচিয়ে
দিলাম ।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, তা কেন হবে । পশ্চপতিরাম বশু
এবং তাঁর স্ত্রীকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করলাম বটে, কিন্তু
আমরা যে পাঁচশোরও বেশি চোরকে ধরে দিলাম, তার বেলা ?

গোয়েন্দা দে কোন কথা বললেন না—তিনি খুশি হয়ে উঠলেন
কিন্তু, অন্তত আগামী কয়েক মাস আর বিড়ি পাকানোর কথা
ভাবতে হবে না । এতেই তিনি খুশি ।



গর্জন গোয়েন্দা

তারাপদ রায়

‘লেগস্ আপ। সামনের ছটো পা মাথার ওপরে তুলুন
মিঃ রাইট।’ বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ঠগ মিঃ রাইট অবাক হয়ে
সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কী হাস্যকর, এই রোগা বেঁটে মোকটা, এই বোকা-বোকা
চেহারার বদমাইশ্টা ! বদমাইশ্টাকে দেখে রাইটের সারা শরীর
তেলে-বেগুনে জলে গেলো। রাইট নিজেই বুঝতে পারলেন না কী
করে এই বোকা বদমাইশ্টার কাছে এত বেকায়দায় পড়লেন তিনি।
এখন আর করার কিছু নেই ! হাত ছটো মাথার ওপরে তুলতেই
হবে, কেননা সামনে উচ্চত রিভলভার যে হাস্যকর বোকা বদমাইশ্টা
দাঢ়িয়ে, সে-ই গর্জন গোয়েন্দা। তার হাত থেকে নিষ্ঠার পাবে
এমন সাধা নেই কোনো জোচ্ছোরে।

রাইট হাত তুলতে এক্ষু ইতস্তত করছিলেন। আবার শোনা
গেলো গর্জনের বজ্রগর্জন, ‘লেগস্ আপ। সামনের পা ছুটি তুলুন।’

কী আর করা যাবে, বাধ্য হয়ে হাত তুলতে হলো। মনে মনে
ক্ষিপ্ত হতে থাকেন বিখ্যাত ঠগ। এই ধরনের কথাবার্তা বা আদেশ
ঠার পক্ষে পালন করা মোটেই সম্মানজনক নয়। ‘লেগস আপ,
সামনের ছটো পা ! আমি কী গোরু না গাধা ? আমার এ-ছটো
পা নয়, হাত !’ আত্মসম্মান রক্ষার প্রয়োজন থেকেই বা সাহেবের
বাচ্চা বলে স্পষ্টবাদিতার শ্বশের জগতে হাত মাথার ওপরে তুলতে
তুলতে রাইট গর্জনকে জানিয়ে দেন।

গর্জন কিন্তু অক্ষেপণ করেন না। ‘ও তাই নাকি, তাই নাকি’,
একটু অবাকই হন গর্জন, ‘কেন আগে তো বুঝিনি ! আমি ভেবে-

ଛିଲୁମ ଚାରଟିଇ ବୁଝି ପା ।’ ତାରପର ଏକଟ୍ ଥେକେ ମୃଦୁ ହାସଟେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେନ, ତାହୁଁ ବୋଧ ହୁଯ ଲ୍ୟାଜ, ଶିଂ-ଟିଂଓ ତୋମାଇ କିଛୁ ନେଇ ?

କଳକାତାର ଏଲେ ଏହି ରକମ ଅପଗାନ ଏହି ରକମ ବିପଦେର ସମ୍ଭାବନା ଏ କଥା ସୁଣଙ୍କରେଓ ଜାନତେ ବା ବୁଝତେ ପାରଲେ ରାଇଟ କଥନେଇ କୁଯାଲାଲାମପୁର ଛାଡ଼ିବେ ନା । କୁଯାଲାଲାମପୁରେ ଅବଶ୍ୟ ଶେଷେର ଦିକେ ବେଶ ଏକଟ୍ ଅମୁଖବିଦ୍ୟାଇ ହେବିଲୋ । ଓଖାନକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଚୋରଦେର ଓପର ‘ତିନି’ ସମ୍ପର୍କି ଯେ ବାଟପାଡ଼ିଟା କରିଛିଲେ, ଅର୍ଥାଏ ବିନା ଅପ୍ରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗାର କୌଶଳୀ ସନ୍ତ୍ର ନାମ ଦିଯେ ଯେ ଜିନିମଟା ବେଚିଛିଲେନ, ମେଟା ଯେ ଆସଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଗେର ଏକ ଧରନେର ଜାପାନୀ ଟିତ୍ର ମାରାର ଝାଁତି-କଳ ମେଟା ପ୍ରକାଶ ହେଁ ପଡ଼େଛିଲୋ । ଏହି ଧରନେବ ଶ ଦେଡକ ଝାଁତି-କଳ ପୁରୋନୋ ଲୋହାର ଦରେ ଏକଟା ଉଠେ ଯାଓଯା କୋମ୍ପାନିର ଦାରୋ-ସାନେର କାହିଁ ଥେକେ କିମେ ଏନେଛିଲେନ ଟୋକିଯୋ ଥେକେ ଚଲେ ଆସାର ସମୟ । ମେଇ ଝାଁତିକଳଗୁଲିଇ କୁଯାଲାଲାମପୁରେର ନତୁନ ଚୋରେରା ମହୋତ୍ସାହେ କ୍ରସ କରିଛିଲୋ, କିନ୍ତୁ କୁଯାଲାଲାମପୁର ଛାଡ଼ିବାର ଆଗେଇ କଥେକଟା ଚ୍ୟାଂଡ଼ା ଚୋର ଧରା ପଡ଼େ ଯାଓଯାଯା ଅନ୍ତାତ୍ ଚୋରେରା ତାକେ ମାରେ ଆର କି ! ପିଂଦେଲରା ଆର କୀ ବୁଝବେ ବାଟପାଡ଼ର ମର୍ମ ? ବାଧ୍ୟ ହେଁଇ ତାକେ କୁଯାଲାଲାମପୁର ଛାଡ଼ିବେ ହତୋ । ଅବଶ୍ୟ ଶେଷେ ଏକଟା ଚାଲ ଦିଯେଛିଲେନ ଏହି ବଲେ ଯେ ଏହି ତାଲା ଭାଙ୍ଗାର ସନ୍ତ୍ରଗୁଲେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ଗେଲେ ଏକ ଧରନେର ଚୁମ୍ବକ ଲାଗବେ—ମେଇ ଚୁମ୍ବକଟା କେଉ ବ୍ୟବହାର କରେନି ବଲେ ବିପଦେ ପଡ଼େଛେ । ଚୋରେରା ଧରେଛିଲୋ, ‘କେନ ତୁମି ତାହୁଁ ଚୁମ୍ବକଟା ମୁହଁ ଦାସ ନି ?’

ମିଃ ରାଇଟ ବଲେଛିଲେନ, ‘ତୋମରା କି କେଉ ଚେଯେଛିଲେ ? ତାର ଯେ ଅନେକ ଦାମ,’ ଆର ମନେ ମନେ ଟିକ କରେ ଫେଲେଛିଲେନ ଏହି ସୁଯୋଗେ ମେଇ ବିଶେଷ ଚୁମ୍ବକ ବଲେ ଅନ୍ତ କିଛୁ ଚାଲିଯେ ଦିଯେ ଏକଟା ମୋଟା ମତନ ଦାସ ମେବେ ଓଖାନ ଥେକେ ମରେ ପଡ଼ିବେନ । ଚୋରଦେର ସଙ୍ଗେଓ ଚୁକ୍ରି ହସ୍ତ-ଛିଲୋ, ଛୟ ମାସେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ଭାୟ ତିନି ଏହି ଚୁମ୍ବକଗୁଲେ ସରବରାହ କରିବେନ ।

এদিকে মিঃ রাইটও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। চোরেদের সঙ্গে কি ব্যবসা হয়! তিনি হলেন বাটপাড়, তাঁর ব্যবসা ভজ্জ্বলোকদের সঙ্গে! লঙ্ঘনে যুদ্ধের সময়ে তিনি ‘বোমার আঘাত-জনিত দুষ্পূর্ব ক্ষয় নিবারণের জন্য এবং আঞ্চ উপশম করবার মসম’ তৈরী করে বেচেছিলেন শ্রেফ তার্পিন তেলে আলুর খোসা সেক্ষ করে শিশিতে ভরে দেড় মিলিয়ন শিশি। কুয়ালালামপুরের চোরেদের ব্যবহারে তাঁর আঞ্চমর্যাদাবোধ গুৰু আহত হয়েছিলো।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। হাত ছটো মাথার উপরে তুলে ঠায় দাঢ়িয়ে থাকা কী যে কষ্টকর। যাকে এ-কাজ কখনোই করতে হয়নি, তার পক্ষে এটা বোৰা সন্তুষ্ট নয়। মিঃ রাইট এই ভাবে দাঢ়িয়ে মনে মনে রাগতে থাকেন। না, ঠিক গর্জন গোয়েন্দার উপরে নয়। আর তার উপরে রাগ করে লাভই বা কী? রাইটের রাগ হয় ওয়াং লিয়াং চু-র উপর।

ওয়াং লিয়াং চু, মানে কুয়ালালামপুরের এক কুখ্যাত জুয়াচোর, যে তাঁকে এই কলকাতা আসবাব পরামর্শ দিয়েছিলো। ওয়াং লিয়াং চু-কে কুয়ালালামপুরে সবাই জোচোর চু’বলে এক নামে চিনতে পারতো। সেই রাইটকে বলেছিলো, ‘আরে সাহেব, আমিহ পারলুম না আর তুমি করবে বাটপাড়ি এই কুয়ালালামপুরে! সিঁদেল চোরদের হাতে খুন না হতে চাও তো, সত্যি সত্যি নিজের ভালো চাও তো, পালাও এখান থেকে।’

রাইটের মুখের ভাবগতিতে জোচোর চু বুঝতে পেরেছিলো। রাইট মনস্থির করতে পারছেন না। তখন সে, হয়তো নিজের স্বার্থেই কুয়ালালামপুর থেকে রাইটকে কৌশলে সরিয়ে নিজে এক-চেত্র বাটপাড় হওয়ার লোভেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রায় গায়ে পড়ে রাইটকে পরামর্শ দিলো, ‘সাহেব, তুমি কলকাতায় ভেগে যাও।’

‘কলকাতা? ক্যালকাটা?’ ক্যালকাটা সম্পর্কে রাইটের অশ্বেগ যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো।

‘ইয়েস সাহেব, ক্যালকাটা, একেবারে হেভেন, ইডেন গার্ডেন।—
রাস্তাধাটে সোকজন ঠকবার জন্মে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’ আসল
সাফল্যের উত্তেজনায় ওয়াং লিয়াং চু যথেষ্ট রঞ্জিত করে বর্ণনা করে
তার নিজের প্রাক্তন সাফল্যের কথা। ‘আমার জুতোর দোকান’
ছিলো চীনেপাড়ায়। এক এক জোড়া কাঁচা চামড়ার জুতোয় লাভ
হতো দশ টাকা। আর খন্দের কালার ব্রাইগ মানে রঙকানা হলে
পনেরো টাকা।’

‘রঙকানা হলে পাঁচ টাকা বেশি কেন?’ বেশ অবাক হয়েই
রাইট প্রশ্ন করেছিলেন।

‘হু-রঙের হু-পাটি দিতুম বাঞ্ছে। তার আগে কয়েক রঙের
জুতো কালো, বাদামি, লাল মিশিয়ে যাচাই করে নিতুম খন্দের রঙ-
কানা কি ন। তা কলকাতার অর্ধেক লোকেরই চোখ খারাপ !
তাতে রঙকানা, ভেজাল ছাড়া আর কিছু খেতে পায় তো।’ একটু
দম নিয়ে জোচোর চু বলে যায়, ‘তারপর সেই জুতো পাঞ্চাতে
এলেই বাছাধনের কান মলে আদায় করেন্তিম আরও পাঁচ টাকা।’
প্রথমে স্বীকারই করতাম ন। যে জুতো জোড়া আমারই দোকানের।
আর তা ছাড়া প্রত্যেক জোড়া জুতোর সঙ্গে উপরি পাওনা ছিলো
পাঁচ টাকা ফোড়া কাটার জন্ম। এ ছাড়া ছিলো ফোক্সার মলম।
নাম দিয়েছিলাম “মু-চুম”—প্রত্যেক ফাইল দেড় টাকা।’

রাইট একেবারে হতভন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, ‘ফোড়া, ফোক্সা
এগুলো আবার জুতোর দোকানে কেন?’

জোচোর চু বলেছিলো, ‘আরে সাহেব, এই তো হলো সাইড
বিজনেস। কাঁচা চামড়ার জুতো পায়ে দিলে ফোড়া হবে না
লোকের, ফোক্সা পড়বে না? কলকাতার গেলে দেখবে প্রত্যেক
চীনে জুতোর দোকানের সঙ্গে একটা করে ফোড়া-ফোক্সা সারানোর
দোকান। সাইনবোর্ড টাঙানো আছে, “চীনা সার্জন”। এক
জোড়া জুতো সেলাই করার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে ফোড়া

কটে পাঁচ টাকা পাওয়া যেতো—অনেক খন্দেরের পায়ে আবার ফাড়ার মিছিল বসে যেতো। সে সব কথা না হয় ছেড়েই দিলে।’

কিন্তু এত সহজে চু-কে ছাড়েন রাইট? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক হণি জিগেস করে, অনেক জেনেশনে তবে ছেড়েছিলেন। আর তার পরের জাহাঙ্গী ভূয়া পাসপোর্টে চলে গেছিলেন কোচিন। তারপর কোচিন থেকে সোজা কলকাতা।

কলকাতায় এসে গঃ রাইট ছ-চার দিন ঘূরে ফিরে সব দেখে ওনে নিজেন কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। একটা প্রাইভেট গাড়ি তিনি মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে নিলেন, তারপর এক একটা হাটেলে ছ-দিন তিনিদিন করে থাকতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে হাজ গুচিয়ে নিতে লাগলেন নিজের।

হপুরের দিকে চৌরঙ্গী আর ডালহৌসী পাড়ায় যেতো সব বড়ো বড়ো রেডিও, ফ্রিজের দোকান আছে সেখানে গিয়ে সবচেয়ে দামী জিনিসটা দেখতেন। এই রকম ভাবে তিনি চারটে জিনিস বেছে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিয়ে বলতেন, ‘এগুলোর একটা আমি বছে নেবো। কিন্তু তার আগে আমার মেমসাহেবকে একবার দেখানো দরকার।’

দোকানদার কিছু ইতস্তত অবশ্যই করতো, কিন্তু ফিটফাট সাহেব, চান্সেল ইংবেজি, আর তা ছাড়া রাইটই বলতেন, ‘আপনার একজন হর্চারী আমার সঙ্গে গাড়িতে এগুলো নিয়ে আসুক। যেটা মম-নাহেবের পছন্দ হয় রেখে দেবো, অন্তগুলো ফেরৎ নিয়ে আসবে। ত্রি আমার গাড়ি দাঢ়িয়ে রয়েছে। আপনাদের যদি আপন্তি না থাকে মাল কটা তুলে দিন।’

এর পরে কি আর কোনো সন্দেহ হয়? কোনো আপন্তি থাকতে পারে? আর সঙ্গে তো দোকানের বিশ্বস্ত কর্মচারীই আছে! তা ছাড়া, এই রকম একটা শ্বেতাঙ্গ খন্দের, আমি বিশ্বাস না করলেও

আৱ দশজন দোকানদাৰ আছে তাৱা নিশ্চয়ই দেবে, তখন
তাদেৱটাই বিক্ৰি হবে।

মুতৱাং সব দোকানদাৰই মুখে যথাসাধ্য হাসি ফুটিয়ে বলেছে,
'ইয়েস সার। ঠিক হায় সার, এই এখনি তুলে দিচ্ছ এগুলো
আপনাৰ গাড়িতে।' তাৱপৱেই তাৱা হাঁকডাক শুক কৱে দেয়,
'এই জনার্দন, এগুলো ঐ গাড়িটাতে তুলে দে। এই সাবধান,
দেখিস ভাঙে না যেন। আৱ হ্যা, গোপালবাবু, আপনি সাহেবেৰ
সঙ্গে যান। মেমসাহেবকে খুব ভালো কৱে চালিয়ে একেবাৱে
যাকে বলে স্টাটিসফাই কৱে তাৱপৱে আসবেন।'

ততক্ষণে রাইট দোকানদাৰেৰ দিকে মুখ কৱে বলেছেন, 'ক্যাণ্শ,
না চেক?' এবং সঙ্গে সঙ্গে প্ৰশ্নেৰ উত্তৱেৰ অবকাশ না দিয়েই
বলেছেন, 'বুঝেছি, চেকে অমুবিধা হতে পাৱে। আপনাদেৱ এই
ক্যাণ্শকাটায় কেউ চেক অ্যাক্সেপ্ট কৱতেই চায় না।' ঠিক আছে
ক্যাণ্শেই দিয়ে দেবো।' তাৱপৱ গাড়িৰ দিকে যেতে যেতে প্ৰশ্ন
কৱেছেন, 'হ্যা, আপনাৰ সেলসম্যান যে সঙ্গে যাচ্ছে, সব দাম ঠিক-
ঠাক জানে তো?' দোকানেৰ মালিক বলেছে, 'হ্যা, হ্যা, নিশ্চয়।
ওঁৱ, মানে ঐ গোপালবাবুৰ হাতেই টাকাটা দিয়ে দেবেন।'

এৱ পৱেৰ কাজ খুব সোজা। গড়েৱ মাঠে কিংবা গঙ্গাৰ ধাৱে
কিংবা আলিপুৰ রোডে একটা বেশ নিৰ্জন জায়গা দেখে রাইট
গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছেন। নিৰ্জন জায়গা খুঁজতেও খুব একটা
বেগ পেতে হয় না। দুপুৱেৰ দিকে এ সব অঞ্চলে রাস্তায় কী-ই বা
লোকজন থাকে? কিছুক্ষণ খটখট দুমদাম কৱে ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে
রাইট গোপালবাবুৰ কাছ থেকে প্ৰথমে জেনে নিয়েছেন গাড়িৰ কিছু
বোঝেন কিনা। তাৱপৱ খুব মোলায়েমভাৱে অমুৰোধ কৱেছেন,
'আমি তো কিছুই বৃঢ়তে পাৱছি না। বোধ হয় ঠেলতে পাৱলে

একটু কাজ হতো। আমি স্টিয়ারিংটা ধরছি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো দয়া করে পিছনে গিয়ে ঠেলুন না গাড়িটা।'

সরলচিত্ত বিশ্বস্ত সেলসম্যান যেই না গাড়ির পিছনে গিয়ে হাত লাগিয়েছেন, ভস করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন রাইট। প্রথমে গোপালবাবুর পক্ষে কিছু অনুমান করাই মুশকিল, 'ও সাহেব, ধামাও, আমি রাইলাম যে, আই আ্যাম লেফট হিয়ার, টেক মি!' কিছুক্ষণ হতভস্ব থেকে তারপর গাড়ির পেছনে এই রকম ঢাঁচাতে ঢাঁচাতে উর্ধ্বশাসে ছুটেছেন—কিন্তু ততক্ষণে রাইট বেপান্ত।

উদীয়মান ডেটিস্ট ডঃ জি. কে. বসু তাঁর হাজরার চেষ্টারে বসে গোপালবাবুর কাছে এই ঘটনা শুনছিলেন। ডঃ জি. কে. বসুর পুরো নাম গর্জন কুমার বসু। দাতের ডাক্তারির পশার এখনও মনোমতো জমেনি আর ছেলেবেলা থেকে গোঁড়েলা গল্প পড়ে পড়ে তিনি অবসর সময়ে শৌখিন গোঁড়েলাগিরি করে সময় কাটান।

যা হোক, গোপালবাবুর মুখে এই রকম শুনে গর্জন বললেন, 'কী সাংঘাতিক কথা!'

গোপালবাবু গর্জনের পিতৃবন্ধু, তিনি প্রায় কেঁদে পড়ে বললেন, 'ঢাখো গর্জন, ব্যাটা বাটপাড় সাহেবের জন্যে আমার চাকরি যেতে বসেছে। ঢাখো, আমার কী দোষ? আমাকেই তো মালিকেরা পাঠালেন। আমি তো আর ইচ্ছে করে যাই নি।'

গর্জন গন্তীরভাবে বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না গোপালকাকা, আমি ব্যাটাকে ধরে দিছি, কিন্তু তার আগে আমাকে কয়েকটা ব্যাপার জানতে হবে। ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে নিই, কাল আপনি সঙ্গার দিকে বাসায় থাকবেন।'

ছোট বেলায় একটা সিনেমা দেখে রবীন্দ্রনাথের 'ঠাঁদের হাসির বাধ ভেঙেছে' গানটা গর্জনের খুব ভালো লেগেছিলো। এতদিনে গানের কথাগুলো ভুলে গেছেন, কিন্তু শুরুটা মনে আছে, সেই স্বরে

গর্জন এখন অন্ত একটা গান ধরেন ; ঠিক গান নয়, একটা সংস্কৃত 'শ্লোক' :— 'বুদ্ধির্বস্তু বলং তস্তু...'

...শশকেন নিপাতিত !'

গোপালকাকা চলে যাওয়ার পর গর্জন একা একা বসে এই 'গানটা গাইতে লাগলেন'। তারপর গান হয়ে গেলে তার ছোকরা 'অ্যাসিস্ট্যান্টটাকে ডাকলেন, 'শশক, এক কাপ চা।' বলা বাহুল গর্জন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার আসল নাম গৌরগোবিন্দ, তাবে শশক বলে ডাকতেন।

চা-টা খেয়ে সব প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। একেবারে হাতে নাতে ধরতে হবে সাহেবকে। এই জুয়াচোরগুলো ধরা পড়ে অতি সোজে, যে জুয়াচুরি সহজেই একবার করে আসা যায় সেটা বারবা বাহাদুরিতে আর লোভে মারা পড়ে জুয়াচোরগুলো।

পরদিন গোপালকাকার সঙ্গে পরামর্শ করে চৌরঙ্গী পাড়াতেই অন্ত একটা রেডিয়োর দোকানে মালিকদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে তপুরে দিকে সেলসম্যান হিসেবে বিনে মাইনের কাজে ঢুকে গেলেন গর্জন।

পরে সত্যিই একদিন ফাঁদে পা দিলেন রাইট। দোকানে পদেওয়ামাত্র পুলিশে টেলিফোন করা যেতো, কিন্তু গর্জন সহজে পুলিশে যেতে রাজি নন, তাছাড়া হাতেনাতে ধরতে হবে তো আগেই মালিকদের সব বোঝানো ছিলো, তাছাড়া ঝুঁকি হিসেবে ধারদেনো করে হাজার কয়েক টাকা নগদ জামিনও রেখেছিলেন গর্জন।

স্বতরাং রাইটের কিছুই অনুবিধি হলো না। চারটে দামী রেডিয়ো সুন্দর দোকান থেকে গাড়িতে গিয়ে উঠতে, সঙ্গে গর্জণ গোয়েন্দা উঠলেন সেলসম্যান হিসেবে—যিনি গিয়ে রাইটের কল্পিত মেমসাহেবকে রেডিয়ো পছন্দ করাবেন। গর্জন একেবারে নিরীং চেহারার, রাইটের একেবারে সন্দেহ হয়নি।

তারপর গড়ের মাঠের মাঝামাঝি সেই একই নাটকের পুনরা-

অভিনয় হলো। সেই গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া, সেই খটাখট
ক্মাদম, তারপর অমুরোধ, ‘যদি কিছু মনে না করেন তো গাড়িটা
কি একটু ঠেলতে পারবেন।’

শুধু সামাজ্য পরিবর্তন, এবাবে গোপালবাবুর স্থানে গর্জন
গায়েন্দা। পকেটে রিভলভারটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে,
নাদের হাসির স্বরে বুদ্ধিষ্ঠ বলং তস্য গুনগুন করতে করতে, ‘ইয়েস
ইয়েস’ বলে গর্জন গাড়ি থেকে নেমে পিছনে চলে গেলেন ঠেলতে।

পিছনে গিয়ে রাইটের গাড়ি স্টার্ট নেবার এক মুহূর্ত স্বয়েগ
॥ দিয়ে হাওয়া ছেড়ে দিলেন হটে টায়ারের। হাওয়া বেরিয়ে
হাওয়ার শব্দে ‘কী হলো, হোয়াটস দি ম্যাটার,’ বলে রাইট
কাফিয়ে বেরিয়ে এলেন গাড়ির পিছনে। আর তখন সেখানে
রিভলভার উঠিয়ে দাঢ়িয়ে রয়েছেন গর্জন গোয়েন্দা ; রাইট মুখোমুখি
তেই—‘লেগস্ আপ। সামনের হটে পা মাথার উপরে তুলুন,
মঃ রাইট।’

ভাগলপুরে গোয়েন্দাগিরি
অসিত গুপ্ত

গরমের চুটিতে ভোম্বল মামার বাড়ি বেড়াতে গেল। ওর মামার বাড়ি হচ্ছে ভাগলপুরে। মাঝীমা অনেকদিন ধরেই লিখ-ছিলেন, ভোম্বল, একবার এখানে বেড়িয়ে যাস।

তা ভোম্বল যায় নি। না যাওয়ার আসল কারণ হচ্ছে ওর মামা। মামাকে ভোম্বল জীবনে একবারই মোটে দেখেছে। কিন্তু সেই প্রথম দেখার সময় যা ভয় চুকে গিয়েছিল, সে ভয় এখনও ওর যায় নি।

ওর মামা ভাগলপুরের জুবিলী কলেজে অঙ্ক কষান। অঙ্ক কষাতে কষাতে ওর চেহারা আর মেজাজটা কি রকম জটিল হয়ে গিয়েছিল। ভোম্বলকে প্রথম দিন দেখেই এক সরল করতে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ভোম্বলের ধারণা, লোক জটিল না হলে কেউ প্রথম দিনেই ভাগ্নেকে সরল করতে দেয়! তার উপর মামার ছিল ইয়া দাঢ়ি আর গোল চশমার আড়ালে বড় বড় লাল চোখ।

তাই, ভোম্বল কিছুতে মামার বাড়ি ষেতে চাইত না। যতবারই মামার বাড়ি যাবার কথা উঠত, ভোম্বল এড়িয়ে যেত। মামাকে যখন ও প্রথম দেখে তখন ওর বয়স ছিল নয়, এখন বারো। এই তিনি বছর ভোম্বল মামার বাড়িকে সমানে পাশ কাটিয়েছে।

কিন্তু এবার ওকে ষেতেই হল। কারণ, ভোম্বলের মা তার ভাইকে আর না দেখে থাকতে পারছিলেন না। তাছাড়া, এতদিনে ওর মামা-ভৌতি একটু কমেছিল। বয়স তো বাঢ়েছে! মামাকে ভয়—লোকে শুনলে বলবে কী! কিন্তু ভয় কমার আরও একটু ব্যাপার ছিল।

এৰ মধ্যে ভোম্পল এন্টাৱ গোয়েন্দা গল্প পড়ে ফেলেছিল। ধাটেৱ তলায় ঢুকে, পড়াৱ বইঘৰে নীচে চাপা দিয়ে, সিঁড়িৰ তলায় ষুঁটেৱ বস্তাৱ ওপৰ বসে ঘামতে ঘামতে একটাও ডিটেকটিভ বই ও বাদ রাখেনি। বিমল-কুমাৱ, জয়ন্ত-মাণিক, কিৱীটি রায়, হুকু কাশি কাউকে ছাড়েনি।

পড়ে বুঝেছে, এদেৱ কি সাহস ! গোয়েন্দাদেৱ সাহস না হলে কখনো চলে ! ভোম্পলও যে গোয়েন্দা হতে চায়। স্বতৰাং ভোম্পলেৱ সাহস চাই। তাহাড়া, বইতে কোথাও লেখা নেই যে ঐ সব নামজাদা গোয়েন্দারা তাদেৱ মামাকে ভয় কৱত।

এমন কি, পুরোদস্তৱ গোয়েন্দা হবাৱ জন্তে ভোম্পল চুপি চুপি একবাৱ এক কাণ কৱেছিল। জয়ন্ত-মাণিকেৱ গল্পে আছে যে, যখনই মাথায় কোন নতুন বুদ্ধি খেলত, তখনই ঘন ঘন নশ্চি নিত জয়ন্ত। ভোম্পলও তাই দেখাদেৰি টিফিনেৱ পয়সা থেকে বাঁচিয়ে চার পয়সাৱ নশ্চি কিনেছিল। খুব সাবধানে, লুকিয়ে লুকিয়ে হু একবাৱ টেনেও দেখেছিল, যদি কোন বুদ্ধি খেলে। কিন্তু বুদ্ধি খেলছে কিনা পৱখ কৱবে কী কৱে।

মামলা কোথায় ! কোন সুন্দৰবাবু ছই কৱতে কৱতে এসে তো রঞ্জ-চুৱিৱ ব্বৰ কিংবা হিমালয়েৱ ভয়কৱেৱ কথা বলছেন না ! অত কথা কি, বাড়িতে পৰ্যন্ত একটা ছোটখাট গোয়েন্দাগিৱিৱ সুযোগ পেল না ভোম্পল। ঠাকুমাকেও সে কতবাৱ বলেছে, ‘দেখ তো তোমাদেৱ কিছু চুৱি টুৱি গেল কি না।’

ঠাকুমা বুড়ো মানুষ। সব ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠেন। তিনি বললেন, ‘বলিস কিৱে ! চুৱি যাবে কেন ? না, না, আমাদেৱ বাড়িতে কখনো চুৱি টুৱি হয় না বাপু।’

‘ঠিক বলচ, চুৱি হয় না ? ভেবে দেখ ভালো কৱে !’

ঠাকুমা ভেবেই আকুল। শেষে কিছু ঠাহৰ কৱতে না পেৱে বললেন, ‘তুই বড় পাজী। খালি খালি ভয় দেখাস !’

‘আমসত্ত চুরি যায় না ? প্রায়ই যে আমসত্ত কমে যাব সেটা কী ?’ ভোস্বলের একধা শুনে মা অমনিং মুখ সুরিয়ে হেসে চলে গেলেন। আর ঠাকুমার মুখটা যেন ছাই হয়ে গেল।

এর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল। ঠাকুমা বুড়ো হয়েছিলেন তো ! তাই তাঁর একটু লোভ বেড়েছিল, সত্য কথা বলতে কি, তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রায়ই আমসত্ত খেতেন।

কিন্তু ভোস্বলের গোয়েন্দাগিরি ঐ পর্যন্ত। আর, একে গোয়েন্দাগিরিও বলা যায় না। ঠাকুমার এই ছোটখাট চুরির কথা বাড়িশুন্দ সবাই জানে।

তবে, ভাগলপুরে গিয়ে ভোস্বলের মস্ত লাভ ইল। গোয়েন্দা-গিরির দিক থেকে লাভ। যেতেই মামী বললেন বটে, ‘আয়, আয় বাবা ভোস্বল !’ কিন্তু ভোস্বলের চোখ মামী এড়াবেন কী করে ! মুখ দেখেই সে বুঝল, কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। নইলে মামীর মুখ এত শুকনো কেন !

মামা অবশ্য দূর থেকে দেখে বললেন, ‘কিরে, তুই যে মস্ত বড় হয়ে গেছিস দেখছি। কাল ছপুরে আসিস তো ! দেখব, কি রকম অঙ্গ শিখেছিস তুই !’ বলেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়ার ঘরে চলে গেলেন।

ভোস্বল যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সক্ষেবেজা মামী তাঁর ছবের কথা বলছিলেন ভোস্বলের মার কাছে। ভোস্বল খাবার ঘরে বসে ভাগলপুরের বিধ্যাত শাহী টোস্ট খেতে খেতে শুনল ব্যাপারটা।

ভোস্বলের মামীমা বলছিলেন, ‘কি আর বলব ঠাকুরবি ! আজ কতদিন হল প্রায়ই পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা করে চুরি যাচ্ছে আমার। কিছুইতেই ধরতে পারছি না কি করে যাচ্ছে !’

মা বললেন, ‘বল কি বৌদি, এ তো ভালো কথা নয়। বাড়িতে চোর পুষে রাখা থুব ভঙ্গের কথা !’

‘তারপর শোন। পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা যাচ্ছিল, যাচ্ছিল—ওমা
সেদিন দেখি ওর সেই ঘড়িটা পর্যন্ত নেই।’

ঘড়িটা হচ্ছে আগেকার ওয়েস্ট এণ্ড ঘড়ি। ঠাট্টা করে লোকে
যাকে আমপাড়া ঘড়ি বলত। মামার বিয়ের সময় পাওয়া।

শুনেই ভোম্পল মনে মনে সাজিয়ে নিল ব্যাপারটা। প্রথমত
পয়সা চুরি যাওয়া। দ্বিতীয়ত ঘড়ি চুরি যাওয়া। বাড়িতে সন্দেহ
করার মতো কে কে আছে! এক হচ্ছে—রামখিলোন চাকর।
ছই—লহমী দাই। তিন—এই তিন নম্বরে এসে ভোম্পল একটু
ভাবতে লাগল।

ভোম্পল দেখেছে পাকা গোয়েন্দারা কাউকে সন্দেহ করতে
ছাড়ে না। প্রথম থেকেই তারা ধরে নেয়, অপরাধী যে কেউ হতে
পারে। তাই, ভোম্পল তিন নম্বরে তার মামাতো ভাই আঁটিলিকে
ফেলল। আঁটিলৈর ভালো নাম অবশ্য জীমূতবাহন।

আঁটিল ওর চেয়ে বয়সে বছর তিনেকের বড়। কিন্তু ভোম্পল
ওকে কিছুতে দাদা বলতে চায় না বলে সব সময় ভাববাচ্য কথা
যলত। যেমন, ‘এই যে, কী করা হচ্ছে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে’
এই রকম আর কি।

ভোম্পলের নজর গোয়েন্দার নজর। সে দুদিন ভাগলপুরে এসে
ঠিক জেনে ফেলল যে, আঁটিল লেখা পড়ায় বেদম ফাঁকি দেয়।
আর, আদমপুরের কাছে ওর এক আস্তা আছে। স্বতরাং ওকে
সন্দেহ করা চলতে পারে।

ভোম্পল একদিন সোজাসুজি ওর মামীকে গিয়ে বলল, ‘আছা
সব ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলতো মামীমা। কিছু বাদ দিও
না। তোমাদের কাছে যা দরকারী মনে হয় না, আমাদের কাছে
তা দরকারী।’

মামীমা তো অবাক।

‘কী খুলে বলনা রে? কী দরকারী?’

‘ওমা, তুমি বুঝি জাননা বৌদ্ধি। ছেলে যে হচ্ছেন সখের
টিকটিকি !’

‘কিসের টিকটিকি ?’

‘আহা, বলনা ভোস্বল। কি যে বলে ছাই। ঐ যে যারা
চোর খুঁজে এই সব ধরে গো.....’

‘তারা তো পুলিশ !’

পুলিশ ! ভোস্বল জানত মামীমা ঐ রকম ফুলিশের মতো
কথা বলবেন। যদিও তিনি গুরুজন লোক কিন্তু একটুও বুদ্ধি না
থাকলে কখনো ভালো লাগে ! সবচেয়ে রাগ হল তার মার শুপর।
মা টিকটিকি কথাটা বলতে গেশেন কেন ? সবাই ডিটেক্টিভদের
ঠাট্টা নবে বলে টিকটিকি। ভোস্বল কি ঠাট্টার পাত্র !

‘টিকটিকি নয়, পুলিশও নয়—ডিটেক্টিভ !’ রাখভারি গলায়
বলল ভোস্বল। ‘বাংলা ভাষায় যাকে বলে গোয়েন্দা !’

মামীমা বললেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদের কথা আমি খুব জানি।
কিন্তু তুই কী জানতে চাইছিলি বলতো ভোস্বল ?’

‘তোমার টাকা পয়সা কোথায় পাকে ?’

‘কেন, ক্যাশবাজ্জে !’ মামী বললেন।

‘সেই ক্যাশবাজ্জের চাবি থাকে কার কাছে ?’

আমার কাছে থাকে বাবা। এটি দেখনা, আমার আঁচলে
রয়েছে। অবশ্য তোর মামাও দরকার হলে খোলেন। উনি যা
ভুলো সোক, সেইজন্তে ওর কাছে টাকা পয়সা কিছু রাখি না।’

‘হঁ। আচ্ছা, বাজ্জটা বাইরে থকে ভেঙেছিল কেউ....কোনদিন ?’

‘না না। সে সব কিছু হয়নি বাবা। খালি পয়সা মেলাতে
গিয়ে দেখি প্রায়ই পেঁয়ষট্টি নয়া পয়সা করে কম পড়ে। বাজ্জ যেমন
তেমনি আছে।’

‘আচ্ছা, মামীমা তুমি খুব ঘুমোও ?’

ভাগ্নের কথা শুনে মামীমা হতভস্ত হলেন।

‘ଘୁମ କୀ ବଲାଛିଲ । ଆମାର ବଲେ ମରବାର ଫୁରସଂ ନେହ । ଘୁମ ସେଇ ଏକେବାରେ ତେରାଣ୍ଟିରେ.....କିନ୍ତୁ ଘୁମେର କଥା କେବ ତୁଇ ଜିଜ୍ଞେସ କରାଛିଲ ?’

‘ନା, ମାନେ ଆମି ଜାନତେ ଚାଇଛି ତୁମି ଯଥନ ତଥନ ସୁମିଯେ ପଡ଼ିଲେ ଆଚଳ ଥେକେ ତୋମାର କେଉଁ ଚାବି ଖୁଲେ ନେଇ କି ନା ।’

ଭୋଷ୍ମଲେର କଥା ଶୁଣେ ମାମୀମା ହେସେଇ ସାରା ହଲେନ ।

‘ସତିୟ ଠାକୁରବି, ଏ ଛେଲେର ବୁଦ୍ଧି ତୋ ଖୁବ । ଏକେବାରେ ପାକା ଟିକଟିକିର ମତୋଇ ବୁଦ୍ଧି ।’

‘ବଲାଛି ଓଟା ଟିକଟିକି ନୟ...ଡିଟେକଟିଭ ।’

ଭୋଷ୍ମଲ ଏବାର ସତିୟ ରେଗେ ଯାଚେ କିନ୍ତୁ । ଏରକମ କରଲେ ସେ ମାମାର ବାଡ଼ିର ଏଇ ମାମଲାଟା ନେବେଇ ନା । ଚୋର ପୌରସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ନୟା ପୌରସା କରେ ଚୁରି କରେ କରେ ଦେବେ ମାମାକେ ଫତୁର କରେ । ତଥନ ଟେରଟି ପାବେ ମଜ୍ଜା !

କିନ୍ତୁ ଭୋଷ୍ମଲ ଆସାର କଦିନ ପରେଇ ଆବାର ପୌରସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ନୟା ପୌରସା ହାଓୟା ହସେ ଗେଲ କ୍ୟାଶବାକ୍ରମ ଥେକେ । ଭୋଷ୍ମଲ, ଯେ ରକମ ନିୟମ ଆଛେ, ଗିଯେ ଘଟନାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରେ ଏଲ । ଆଗେ କାଉକେ ଘଟନାସ୍ଥଳେର ତିସୀମାନାୟ ଯେତେ ଦିଲ ନା । ପ୍ଲାସ୍ଟାର ଅବ ପ୍ଯାରିସ ନେଇ, ଶୁତରାଂ ଅପରାଧୀର ପାଯେର ଛାପ ବା ହାତେର ଛାପ କିଛୁଇ ନେଓୟା ଯାବେ ନା ।

ତୁ, ଭୋଷ୍ମଲ ଖୁଟିଯେ ଖୁଟିଯେ ସବ ଦେଖଲ । ତାରପର କ୍ୟାଶବାକ୍ରେର ଗା ଥେକେ କି ଏକଟା ଜିନିସ ଆଲଗୋଛେ ତୁଲେ ନିୟେ ଏକ ଟ୍ରକରୋ କାଗଜେ ମୁଢେ ନିଜେର ହାଫ-ପ୍ଯାଟେର ପକେଟେ ରାଖଲ ।

ଓର କାଣ୍ଡ ଦେଖେ ତୋ ସବାଇ ଅବାକ । ମାମାତୋ ଭାଇ ଆଟଟିଲ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଚକି ମୁଚକି ହାସତେ ଲାଗଲ । ତାରପର ସେଇ ଭୋଷ୍ମଲ ଚୁପି ଚୁପି ଏକ ଟିପ ନୟି ନିୟେ ବେରିଯେଛେ, ଅମନି ସେ ଧରେ ବସଲ, ‘କିରେ ତୋମଙ୍ଗା, ତୁଇ ଖୁବ ଭଡ଼କି ଦେଖାଚୁସ ଦେଖତେ ପାଚିଛି !’

ଭୋଷ୍ମଲ ଏକଟୁ ଦମଲ ନା । ସେ ଜାନେ ଅପରାଧୀରା ସବ ସମୟ ଗୋପ୍ନେନ୍ଦ୍ରାଦେର ଭୟ ଦେଖିଯେଇ ଥାକେ । ଆଟଟିଲ ଅପରାଧୀ କିମା ତା

কে বলবে ! সে খুব গভীর গল্পায় বলল, ‘সকলকার সব ভড়কি কিছুদিনের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে !’ তারপর হঠাৎ আঁটিলিকে হকচকিকরে দিয়ে বলল, ‘আদমপুরে কী করা হয় ? বলব মামাকে ?’

আঁটিলি আমতা আমতা করে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। সহজে আর ভোম্পলের মুখোমুখি হয় না।

একদিন মামা ওকে আঁক কষতে ডাকলেন। কিন্তু মামা কিছু বলবার আগেই ভোম্পল সাহস করে বলে ফেলল, ‘একদিন এখানে মিনেমা দেখতে গেলে হয় না ?’

মামা ভোম্পলের এই ছঃসাহস আশা করেন নি। ভোম্পল লক্ষ্য করল, মামার চোখ প্রথমটা একটু চকচক করে উঠেছিল কিন্তু পরমুহূর্তে সেটা চলে গিয়ে লাল টকটকে হয়ে উঠল।

‘না, না, এখানে ওসব বাজে হিন্দী ছবি দেখতে হবে না। পাকা ছেলে কোথাকার !’

মামা ধরকে উঠলেন। তারপর রেগেই বোধ হয়, ভোম্পলকে এক পেঁপায় দশমিকের অঙ্ক কষতে দিলেন।

এর কিছুদিন পরে আরেক দফা পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা চলে গেল মামার ক্যাশবাঞ্জ থেকে।

ভোম্পলরা সেদিন কলকাতায় ফিরবে। সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। মামা পর্যন্ত কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। রামধিলোন চাকর, লছমী দাই সবাই আছে। তারা ভোম্পলের মার কাছ থেকে বখশিস পাবে—সেই আশায় শেষ দিন ছুটে ছুটে কাজ করছিল। মামী আছেন, আঁটিলি আছে, ছোট মামাতো বোন বিজুনী আছে।

সেই সময় ভোম্পল হঠাৎ মাঝ পথে খাওয়া ধামিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঢ়াল। মামী শুধোলেন, ‘কি বাবা ভোম্পল, কোন অসুবিধে হচ্ছে ?’

ভোম্বল সেকথার জবাব দিল না। ভারিকী গলায় আদেশ করল, ‘রামধিলৌন দরয়াজা বন্ধ কর দো।’

সকলে অবাক। রামধিলৌন গুটি গুটি গিয়ে দরজা বন্ধ করে এল। ভোম্বল গলা সাফ করে নিয়ে বলল, ‘এই মামলায়...’

মামা চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, ‘দাঢ়াও। কোন মামলা? কার সঙ্গে মামলা হচ্ছে? আমি তো কিছু জানি না...’

ভোম্বল বলল, ‘তাগুলপুরের মিস্ত্রির বাড়ীর ঘড়ি আর পঁয়ষট্টি নয়। পয়সা করে চুরি যাওয়ার মামলা। আমরা সেই মামলার কিনারা করে ফেলেছি।’

মামী বললেন, ‘বলিস কিরে! কে চুরি করছিল বল তো?’

ভোম্বল সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে বলল, ‘চোর আমাদের মধ্যেই আছে।’

‘প্রথমেই আমি সন্দেহ করেছিলাম রামধিলৌন আর লছমীকে। কিন্তু ওরা পয়সা নিত না। চাবি পাবে কোথায়! মামী তো কখনো ঘুমোয় না আর চাবি আঁচল ছাড়া করে না। ক্যাশব্যাঙ্ক ভাঙ্গা অবস্থাতেও কোনদিন পাওয়া যায়নি। তবু আমি সন্দেহ করা ছাড়লাম না। যদি ওরা কেউ কিংবা অঁটিল বাঙ্গের মাপে আরেকটা চাবি করিয়ে থাকে।

‘সব বাজে কথা। বাঙ্গের মাপে আমি কোন চাবি করাই নি।’
অঁটিল তেড়ে উঠল।

‘আমি তা জানি। তোমার একদম সাহস নেই। তুমি ভৌতুর ডিম। তাই, আদমপুরে যেখানে তুমি আজড়া দিতে যাও, সেখানকার ছবে বলে একটা ছেলে তোমার কাছ থেকে শুয়েষ্ট-এণ্ড ঘড়িটা কেড়ে রেখে দিয়েছে, সেটা আজ্ঞে আদায় করতে পার নি।’

‘অ্যা! মামীমা অঁৎকে উঠলেন। ‘তুই ঘড়ি নিয়েছিলি?’

‘না, মামীমা ও ঘড়ি চুরি করেনি। বন্ধুদের দেখাবার জন্মে

একদিন সখ করে পরে গিয়েছিল। তবে বলে ছেলেটা হচ্ছে মহ' পাঞ্জী। সে শটা কেড়ে নিয়ে আর ফেরত দিচ্ছে না। আমি যখন পয়সার ব্যাপারে আঁটিলিকে সন্দেহ করেছিলাম তখন আদম পুরে গিয়ে একদিন দেখে আসি।'

'এইসব পাঞ্জী ছেলেদের সঙ্গে তোর মেলামেশা।' মাম একেবারে গর্জে উঠলেন। আর আঁটিল চুপ।

'যাক আমরা আসল কথায় ফিরে আসি।' পাকা গোমেন্দা: মতো কথা বলল, ভোম্পল।

'পয়সা আর কে কে নিতে পারে। এক মামী নিজে। কার' তার কাছেই চাবি থাকে। আর মামা। তিনিও বাঙ্গের চাবি খোলেন।'

মামা দাড়ির ফাক দিয়ে ঘ্যাং ঘ্যাং করে শব্দ করলেন। ভোম্পল বুঝল, এটা রাগ। 'কিন্তু এখানে আসার পর প্রথম যেদিন পঁয়ষট্টি পয়সা খোয়া গেল। সেদিন আমি একটা 'ক্লু' পেলাম।'

'কী পেলি? কুলু কী?' মামী আবাব বোকার মতো শুধোলেন।

'কুলু নয়। ক্লু। মানে সূত্র। ক্যাশ বাঙ্গের গায়ে আমি এক গাছা বেশ জম্বা দাড়ি দেখতে পেলাম।' বলেই ভোম্পল মামার দিকে তাকাল। মামার মুখখানা তখন প্রকাণ্ড এক আঁকের মতোই হয়েছে।

'মামা যখন একদিন কলেজ থেকে এসে ঘুমচ্ছিল, আমি তখন চুপি চুপি সেই দাড়িটা নিয়ে মামার দাড়ির সঙ্গে মেপে এলাম। দেখলাম, একই মাপের দাড়ি। সেই থেকে মামার ওপর আমার সন্দেহ হল: কিন্তু মামা পঁয়ষট্টি নয়। পয়সা নিয়ে কী করে? এর পরের দিন মামার জামা কাপড় সব হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম। ঘড়ির পকেটে একটা সিনেমার টিকিটের আধখানা দেখতে পেয়ে বুঝলাম, কী ব্যাপার! মামা লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্তিরে হিন্দী সিনেমা

দখে। জঙ্গার বলতে পারে না। যেদিনকার টিকিট, ভেবে দখলাম মামা সেদিন হ্লাবে যাচ্ছি বলে রাস্তির করে বাড়ী ফরেছিল। তারপর আমি যখন সেদিন মামাকে সিনেমা দেখার পথ বঙ্গলাম, মামা তখন বেজায় খাল্লা হয়ে আমাকে এক পেঁচাম শমিকের অঙ্ক দিয়ে বসলেন।’

‘বলিস কিরে। তোর মামার এই কাণ্ড। ওমা, আমি কোথাই আব?’ মামী চেয়ার থেকে উলটে পড়ে যাব আর কি।

‘তোর মামাকে যে সবাই ভয় করে রে। সবাই যে বলে, উনি গামড়া মুখে আক কষানো ছাড়া আর কিছু পারেন না। ওর পেটে এত বুদ্ধি।’

‘আমি আরো শ্রমাণ পেলাম, যখন পাশের বাড়ীর ভবদেববাবু একদিন বাজার করে ফেরবার সময় মামার কলেজের হিস্ট্রী প্রফেসর হায়কে বলছিলেন, ‘জানেন সহায়বাবু, আমাদের পশুপতিবাবু মৃব ছবি দেখেন। আমার সঙ্গে গ্রায়ই রাস্তিরের শো-তে দেখা হয়।’

এই বলে ভোস্ত পকেট থেকে সিনেমার সেই আধখানা টিকিট বর করে সকলকে দেখাল। তারপর আরেক পকেট থেকে দাঢ়ি-চাষাটা নিয়ে মামার মুখের কাছে এল মেপে দেখতে।

মামা রাগে ঠক ঠক করে কাপতে কাপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়িয়ে বললেন, ‘অকালপক্ষ, ডেঁপো ছেলে কোথাকার! মামার পঞ্জে ইঞ্চার্কি?’

এই বলে তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। এত রেগে গিয়েছিলেন মামা যে, ভোস্তদের স্টেশনে পর্যন্ত পৌছতে যান নি সেদিন।

এক টিপ রনি
মনোরঞ্জন ঘো

সেদিন সকালে সমর সবেমাত্র বসেছে এক গোয়েন্দা-গঞ্জে
কাহিনীকে সাদা কাগজের কারাগারে অঙ্করের শৃঙ্খলে বন্দী করে
রাখার জন্যে, এমন সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

বিরক্তির সঙ্গে রিসিভার তুলে নিল।

—‘হালো !’

অন্য দিক থেকে তাব বন্ধু ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুর্স,
কমিশনার ভূজঙ্গ ধরের কঠস্বর কানে আসে।—‘সমর ? বার্তা
আছ তাহলে ?’

—‘না, আমি বাড়ি নেই।’

—‘তার মানে ?’

—‘সাহেবদের নট এ্যাট হোমের মতন, লোকের সঙ্গে দেখ
করার ইচ্ছে না থাকলে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ও কথা বললে মিথ্য
বলা হয় না। হারাণকে শিখিয়ে রেখেছি, কেউ এলে সোজা বকে
দেবে আমি নেই। টেলিফোন তাকে ধরতে না দিয়ে দেখছি ভুক
করেছি।’

—‘আমাকে এড়ানো অত সহজ নয়। লোককে ধরাই তে
আমার কাজ।’

—‘লোককে না বদলোককে ?’

—‘একই কথা। ধরার আগে পর্যন্ত সবাই ভাল লোক, ধরে
তারপর প্রমাণ করি তারা বদলোক।’

—‘তা বেশ ! কিন্তু আপাতত আমায় ধরার উদ্দেশ্য কী
বাংলাদেশের একজন নিরীহ লেখককে—’

—‘বাজে কথা অনেক হয়েছে। শোনো! আমার হাতে
মাটেই সময় নেই। এখুনি তোমার বাড়ি যাচ্ছি। গিয়েই
তামার গ্রেপ্তার করে আমার গাড়িতে তুলে নেবো। প্রস্তুত
ধাকবে।’

—‘দোহাই! এক সপ্তাহ আমার বাড়ির চৌকাঠ মাড়িও না।
আমারও হাতে মোটেই সময় নেই। পূজো সংখ্যার একটা লেখা
শব্দ—’

সমরকে শেষ করতে না দিয়েই ভুজঙ্গ লাইন কেটে দিলো।
সমর হতাশ হয়ে এক দীর্ঘস্থান ফেললো। মাঝুরের বকুর সঙ্গে
গান্ধার মানেই খানিকটা সময় ব্যয়, যদি সে পুলিশের লোক হয়
তাহলে সেই সঙ্গে কিছু বিপদও যোগ হয়।

গোয়েন্দা কাহিনী লেখায় সমর চৌধুরীর বাংলাদেশে বেশ
চুনাম আছে। নিচক কল্পনা বিলাসী লেখক সে নয়। বাস্তব
ঘটনার উপর ভিত্তি করে লেখা অনেক তদন্ত রহস্যের কাহিনী পাঠক
মহলে তাকে জনপ্রিয় করেছে। তার তৌক্ষ বৃক্ষ, বিশ্বেষণ শক্তি,
অশুমান ক্ষমতা তাকে যেমন রহস্য সাহিত্য রচনায় খ্যাতি এনে
দিয়েছে, তেমনি যর্দাও দিয়েছে পুলিশ মহলে। তার কলেজ
চৌবনের সহপাঠী ভুজঙ্গ ধর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পাওয়ার পর
পুলিশে চাকরি নিয়েছিলো। তারপর অনেক জটিল কেস সতীর্থ
সমরের সাহয়্যে সমাধান করার ফলে বর্তমানে সে ঔমোশন পেয়ে
ডি. সি. ডি. ডি. হয়েছে। তার পাঞ্জাব পড়ে মাঝে মাঝে সধের
গায়েন্দাগিরি সমরকে করতে হয়।

পূজো সংখ্যায় কর্মেক জায়গায় সমরের গল্প দেবার কথা আছে।
বুম থেকে উঠেই সে মনস্ত করেছিলো। আজ যে করেই হোক একটি
গল্প শেষ করবে।

কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যেই ভুজঙ্গ এসে ঘর থেকে টেনে তাকে

বের করলো। কোন ওজর আপত্তিতে কান না দিয়ে সমরের হাত
ধরে প্রায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে তুললো।

সমর বলে, ‘ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা বলে একটা কথা
শুনেছিলাম। এ যুগে অশ্বারোহণ অচল হয়ে এলেও অনেকের
আচরণটা বদলায়নি দেখছি।’

ভুজঙ্গ সিগারেট কেসটা সমরের দিকে ধরে বললো, ‘ঘোড়ায়
জিন তবু আরোহীর ইচ্ছেমতো খুলে ফেলে যাত্রা স্থগিত রাখা
চলতো। কিন্তু ইন্টারন্যাল ফ্লাইটের চাটার্ড প্লেনের তো তোমার
আমার স্বিধে অনুবিধে মতো টাইম টেবিল বদলানো যাবে না।
আর পঁয়তালিশ মিনিট পরেই দমদম এরোড্রাম থেকে একটি প্লেন
সিঙ্গাপুরে রওনা হবে।’

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সমর বললো, ‘তাতে তোমার আমার
কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজ রাখে না। তুমি দেখছি
উড়োজাহাজের খোঁজ রাখছো কলকাতার পাহারাওয়ালা হয়ে।’

—‘পাহারাওয়ালাই বটে। প্লেনের পাইলটকে ভদ্রভাবে
পাহারা দিচ্ছি আমরা সবাই—কাস্টমসের প্রিভেটিভ অফিসার,
সেন্ট্রাল এক্সাইজের এ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টার, সিকিউরিটি কেন্ট্রালের
ডি. সি., ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের আমি। টুইন বীচ এয়ার
ক্রাফ্টে আমেরিকান পাইলট আমাদের কলা দেখিয়ে বোঝের এক
বিধ্যাত জুয়েলার্সকে পথে বসিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টায়
আছেন।’

—‘হ্যাঁ! তোমার কথার মধ্যে রহস্যের গন্ধ রয়েছে। পাঠকদের
কৌতুহল সৃষ্টির জন্য এভাবে কথা বলা লেখকদের একচেটীয়া
ব্যাপার। পুলিশের লোক তুমি, সহজ সরল ভাষায় ব্যাপারটা
সোজা বলে ফেলো।’

যশোর রোড ধরে দমদম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে
ভুজঙ্গ বলল :

—‘ধৰ কাগজে নিশ্চয় দেখেছো। আজকাল আন্তর্জাতিক চোরাকারবাৰারীৰ দল এই দেশেৰ উপৰ একটু নেক নজৰ দিয়েছে। ওয়ালকটেৱ ব্যাপার মনে আছে? নিজস্ব প্ৰেনে বেআইনী সোনা নিয়ে যাবাৰ সময় দিল্লীতে ধৰা পড়েছিলো। তাৰপৰ জামিনে খালাস ধাকাৰ সময় একদিন পালাম বিমান বন্দৰে ভাৱ আটক কৰা প্ৰেনেৰ তদারক কৰতে আসে। এক ফাঁকে পড়ে থাকা প্ৰেনে চেপেই পালিয়ে যায়। দিল্লীৰ পুলিশ, এৱেড়াম অফিসাৱৰা, কাস্টমসেৱ কৰ্মচাৱীৰা বোকা বনলো। কাগজে হৈ চৈ, পাৰ্শ্বামেষ্টে চঁচামেষ্টি—’

—‘হঁ! সমৰ বললো। ‘এসব আমি জানি। আৱও জানি যে সেদিন তোমৰা নিজেদেৱ মধ্যে ব্যঙ্গেৱ হাসি হেসে বুক ফুলিয়ে বলেছিলে, দিল্লীৰ ছাতুখোৱ পুলিশ বলেই ওয়ালকট বোকা বানাতে পাৰলো। আমৰা বাবা ভাতখেকো,—পোট, এৱেড়াম, চীনেপটিৱ শুলু আগলাৱদেৱ ঘাৰেল ক'ৰছি। আমাদেৱ চোখে ধূলো দেবে? তা এখন যেমন হস্তদণ্ড হয়ে এৱেড়ামে ছুটছো, তাতে বুৰাছি তোমাৰ কোন কৃতী শকুৱ পুত্ৰেৱ পদার্পণ হয়েছে।’

‘পদার্পণ নয়, এখন পলায়ন পৰ্বেৱ প্ৰস্তুতি চলছে। ব্যটা আমাদেৱ নাকেৱ ডগা দিয়ে বুক ফুলিয়ে উড়তে চান। সব জানা সত্ত্বেও হাতে নাতে ধৰতে না পাৱাৱ আইনেৱ সাহায্যে তাকে আমৰা আটকাতে পাৰছি না। ওয়ালকটকে নায়ক কৱে তুমি এক গল্প লিখবে বলছিলে। এখন দেখছি ববি গিলকি হচ্ছে ওয়ালকটেৱ ঠাকুৰ্দা। ইনি শুলু আগলাৱ নন, পি সি. সৱকাৱেৱ স্বগোত্ৰীয়।’

—‘তাৰ মানে? ম্যাজিসিয়ান নাকি?’

—‘ৱীতিমতো। জিনিস অদৃশ্য কৱাৱ সিদ্ধহস্ত। পি. সি. সৱকাৱ লোকেৱ চোখেৱ সামনে মোটৱ গাড়ি অদৃশ্য কৱেন, আৱ ইনি মোটৱেৱ চেয়ে দামী ও মটৱেৱ চেয়েও বড় হীৱে সকলেৱ সতৰ্ক নজৰ সত্ত্বেও অদৃশ্য কৰতে পাৱেন। আমৰা তো প্ৰথমে

ভেবেছিলাম তোমার কাছে আসার বদলে এই ভোজবাজি রহস্যান্বয়ের জন্ম পি. সি. সরকারেরই সাহায্য নেবো। নেহতিনি এখন বিদেশে শো দিতে গেছেন—'

—‘ই ! আমায় উন্মেষিত করার জন্ম আত্মসম্মানে ঘা দিকথা বলছো বুঝতে পেরেছি। তার মানে কেসটা জিল, তোমার হালে পানি পাচ্ছ না, তাই আমায় তাতিয়ে কাঞ্জ উদ্ধারের তাই আছো !’

ভুজঙ্গ হেসে ফেলে বললো, ‘সরকারের ম্যাজিক আর সময়ে সজিক দুয়েরই আমি ভক্ত, দুটোই আমার কাছে সমান বিশ্বাসকর।’

—‘প্রশংসা শুনে প্রসন্ন হলাম। দেবতারাও স্তুতে তুষ্ট হামি তো কোন ছার। এবার কেসটা বিশদভাবে বলো !’

—‘কিছুদিন আগে কাগজে দেখেছিলে একটা টুইন বীচ এয় ক্র্যাফট রাতের অন্ধকারে ভুবনেশ্বরে নেমেছিল, যেটা আন্তর্জাতিক চোরাকারবারীদের প্লেন বলে সন্দেহ করা হয়েছিল ?’

—‘হ্যাঁ। আরও একধানা এই রকম বিমান বাইরে থেকলকাতায় আসছে এ খবরও দেখেছি।’

—‘সেটা এসেছে আর তার সঙ্গে আরও অনেক খবর এসেছে সেগুলো খবর কাগজের সংবাদদাতার খবর নয়, গোয়েন্দা বিভাগে গোপন রিপোর্ট। বোম্বে থেকে ওয়্যারলেসে আমাদের হোকোয়াটার্সে এসেছে। ববি গিলকি এখানে আসার আগে তিনি বোম্বেতে কাটিয়েছে। সেখানকার গ্রীনস হোটেলে উঠেছিলে বোম্বে পৌছাবার পরদিন সে ওখানকার বিখ্যাত জুয়েলার্স মেসলীলারাম এ্যাণ্ড কোম্পানীর শো-রুমে গিয়েছিলো। শো-রুমে একটা খুব কম দামের হীরের সে কেনে সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে নগদ দাম সে পকেট থেকে নোট বের করে তখনি দিয়ে দিলে আমরা এখন বুঝছি নগদ নোট দেখিয়ে হীরে কেনা তার ও চালাকি, তার চিটিং বিজনেসের এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট

। লীলারামের বিশ্বাস অর্জন করলো, কথায় কথায় শুনিয়ে দিলো সে
‘শীনস’এ উঠেছে, তার নিজস্ব প্লেন সার্টাক্যুজ এরোড্রামে রয়েছে,
আমেরিকার এক ফিল্ম-প্রডিউসার, পৃথিবী ঘূরতে বেরিয়েছে,
ভিন্ন দেশে ছবি কেনাবেচা করা উদ্দেশ্য। লীলারাম ভাবলো
ইক টিডের মতো এ শোকটা মিলিয়ান নয়, বিলিয়ান ডলারের
লিক, একটি শোসাল মক্কেল ! গিলকি এরপর লীলারামকে জানায়
মনের মতো হীরে পেলে যত টাকাই দামই হোক না কেন সে
নতে অস্তুত ! লীলারাম তখন তার আয়রন-সেফ থেকে দোমী
মৌ সব হীরে সাহেবকে দেখানো শুরু করলো। সাহেবও সেগুলি
তে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা একটা করে
লারামের সামনের টেবিলে রাখতে শুরু করে। নানা ধরনের
না জাতের সে সব তীরে—স্বচ্ছ হীরে, নীলাভ হীরে, কমল হীরে,
নকী হীরে, আক্ষণ হীরে, ক্ষত্রিয় হীরে, বৈশ্য হীরে…’

—‘দাঢ়াও, দাঢ়াও !’ বাধা দিয়ে সমর বললো, ‘আক্ষণ, ক্ষত্রিয়,
ত্ব এ সব বর্ণ-বিভাগ তো মাঝুষের মধ্যেই আছে জানি, তাও শুধু
রাতের মাঝুষের মধ্যে। হীরেদের মধ্যও আবার জাতিভেদ
হচ্ছে নাকি ?’

—‘বা ! সব হীরেই কী এক জাতের নাকি ? বর্ণ অনুসারেই
দের বর্ণ বিভাগ করা হয়েছে। আক্ষণ হীরে হচ্ছে শ্বেতবর্ণের,
ত্রিমু হীরে রক্তবর্ণ, বৈশ্য হীরে পিঙ্গল, শূক্র হীরে কৃষ্ণবর্ণ। যাক,
লারাম গিলকিকে বিদেশী খনিরও অনেক হীরে দেখায়—দক্ষিণ
ক্রিকার জেগারস ফটিনের নীল হীরে, কিম্বার্লির হলদে হীরে,
য়সেলস্টনের শ্বেত হীরে, ডি বিয়ার্সের মেটে হীরে, ত্রিলিয়ান্ট কাট
রে, টেবল কাট হীরে, রোজ কাট হীরে…’

সমর আবার বাধা দিয়ে বলে, ‘বাহাম গোষ্ঠী হীরের বৎশ
রিচয়ে আমার কাজ নেই। তুমি কি জুয়েলার্সদের কাছে খুব
তাস্তাত করছো ? এতো নাম মুখস্ত করলে কি করে ?’

—‘আরে ভাই, গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এ সব জানতে হয়। ভারতের মধ্যে যে সব দামী হীরে-জহরত আছে তা যাতে বাইরে চালান না যায় সেদিকে নজর রাখতে হয়। তোমরা তো শুধু কোহিনুরের কথা জানো। সেটা ছাড়াও পৃথিবীর নামকরা প্রথম দশটা হীরের মধ্যে তিনটে এককালে ভারতবর্ষে ছিল। পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ যে হীরে অর্লফ সেটা মহীশূরের এক দেবমন্দির থেকে এক ফরাসী নাবিক চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো। সে চুরি তোমার ডিটেকটিভ গল্লের প্লট হতে পারে। নাবিক মন্দিরের দ্বার-রক্ষীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের সিঙ্কির নেশায় কাত করে। গভীর রাতে মন্দিরে ঢুকে দেবতার তৃতীয় নেত্র স্বরূপ ঐটা খুলে নিয়ে সেখানে অবিকল ঐ আকারের এক কাঁচের চোখ বসিস্বে দেয়। তা সন্দেশ ধরা পড়ার ভয়ে সে জানুতে গভীর গর্ত করে হীরেটা লুকিয়ে রাখে। যে-জাহাজে করে নাবিকটা পালায় সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ঐ হীরে বিক্রি করে দেয়। ক্যাপ্টেন আমস্টারডামের কাউন্ট অর্লফকে বেচে দেয়। অর্লফ নিজের নামেই হীরেটার নামকরণ করে রুশ-রাণী ক্যাথারিনের কাছে বেচে। হীরেটা এখন রাশিয়ার ক্যুনিস্ট গভর্নমেন্টের কাছে আছে। ওটার দাম প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড।

‘পৃথিবীর সপ্তম হীরে পিট-ডায়মণ্ডের আবিষ্কর্তা শ্রমিককে হত্যা করে এক দস্ত্য। মাঝাজের তখনকার গভর্নর উইলিয়ম পিট নানা হাত ঘোরা হীরেটার সঙ্কান পেয়ে মাত্র বিশ হাজার পাউণ্ডে কিনে নিয়ে ফ্রান্সের রিজেন্ট ফিলিপসকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করে দেয়। পঞ্চদশ লুইষের রাজমুকুটে হীরেটা স্থান পায়, তারপর নেপোলিয়ানের তলোয়ারের বাঁটে বসে। এখন প্যারিসের লুক্স মিউজিয়ামের সেটা আছে।’

‘পৃথিবীর অষ্টম হীরে কোনো ব্যবসায়ীর মারফত ইউরোপে বিক্রির জন্য চালান হয়েছিলো। সেখানে বিখ্যাত বীর চার্লস

ଦି ବାରଗାଣ୍ଡି ଶୋଟା କେନେନ । କିନ୍ତୁ ହର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ ହାରିଯେ ଫେଲେନ । ଏକ ଫରାସୀ ନାବିକ ସେଟୋ ପେଯେ ମାତ୍ର କଥେକ ଖ୍ରାଷ୍ଟ ବିକ୍ରି କରେ ଦେଉ ଡିଉକ ଅବ ଟାଙ୍କାନିକେ । ତାର ନାମାହୁସାରେ ହୀରେର ନାମ ହୟ ଗ୍ର୍ୟାଣ ଡିଉକ । ପରେ ଅଣ୍ଟିଆର ରାଜ୍ଞୀର ସମ୍ପଦି ହସ୍ତେଛିଲୋ ।’

ସମର ଆର ଏକଟା ସିଗାରେଟ ଧରାତେ ଧରାତେ ବଲେ, ‘ଆଚୀନ ଭାରତେ ଭୁଜଙ୍ଗ ଧରେର ମତୋ ପୁଲିଶେର କୋନ ଡି. ସି. ନା ଥାକାୟ ଭାରତେର ସମ୍ପଦ ବିଦେଶେର ରାଜ୍ଭାଗୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ । ଏଥିନ ଆର ସେ ଭସ୍ତ ନେଇ ।’

—‘ଠାଟା ନୟ । ତୋମାୟ ହୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏତ କଥା ବଲିଲାମ ଏହି ଜଣ୍ଯ ସେ ଯାତେ ତୁମି କେମଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲ । ଗିଲକି ଆର ଏକଟି ଐରକମ ଦାମୀ ହୀରେ ନିଯେ ଆର ମିନିଟ କୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ଭାରତ ଥେକେ ପାଲାବେ ।’

—‘ହୀରେର କଥା ଛେଡେ ଗିଲକିର କଥା ବଲୋ । ତାରପର ଲୌଲା-ରାମେର ଦୋକାନେ ସେ କୀ କରିଲୋ ?’

—‘ଅତ ହୀରେର ମଧ୍ୟେ କୋନଟାଇ ତାର ପଛଳ ହଲୋ ନା । ସବ ଦେଖେ ଶୁଣେ ଶେଷେ ସେ ଘାଡ଼ ନେଡ଼େ ଜାନାଲୋ କିଛୁ ନେବେ ନା । ସାହେବେର ସାମନେ ଥେକେ ଲୌଲାରାମେର କର୍ମଚାରୀରୀ ହୀରେଣ୍ଟଲୋ ଉଠିଯେ ଆୟରନ-ଲେଫେ ପୁରେ ରାଖିତେ ଗିଯେ ଦେଖେ ଏକଟି ହୀରେ ଉଧାନ । ଐତିହାସିକ ଭାର୍ଗାସ ହୀରକେର ସୋଲ ଖଣ୍ଡେର ଏକଟି ସେଟି, ସାଇଜ ଚିନେ-ବାଦାମେର ମତୋ, କିନ୍ତୁ ଦାମୀ । ତଥୁନି ହୈ ଚିତ୍ର ପଡ଼େ ଯାଇ । ସାହେବ ସ୍ଵେଚ୍ଛାର ତୁହାତ ମାଧ୍ୟାର ଓପର ତୁଲେ ନିଜେକେ ସାର୍ଟ କରିତେ ଦେଉ । ସାହେବେର ପ୍ଲାଟ୍ କୋଟିର ପକେଟ ହାତଡେ କୋଥାଓ କିଛୁ ପାଓଯା ଯାଇ ନା । ସାହେବ ବଲେ ହୀରେଟା ତାକେ ଦେଖାନୋ ହସ୍ତନି, ଜହରୀ ଭୁଲ କରିଛେ । ଜହରୀ ଲୌଲାରାମ ବଲେ ସେ ତାର ସଂସାରେର ଛେଲେମେହେଦେର ନାମ ଓ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଭୁଲ ହତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଫେର ହୀରେର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଦାମ କଥନୋ ଭୁଲ ହବେ ନା । ତଥୁନି ପୁଲିଶ ଡାକା ହୟ । ତାରା ଏସେ ଆବାର ସାର୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ହୀରେଟା ପାର ନା । ଗ୍ର୍ୟାଣ୍ଡାଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହେର ବଶେ ସାହେବକେ ଆଟକାନୋ ଯାଇ ନା । ସାହେବକେ ତାରା ଛେଡେ ଦିତେ ବାଧ୍ୟ ହୟ । କିନ୍ତୁ ସାଦା ପୋଷାକେ ଗୋପ୍ରେନ୍ଦ୍ରାରା ତାର

ওপৰ কড়া নজৰ রাখে। গোপনে হোটেলের মালিকের সঙ্গে
বন্দোবস্তু করে এক গোয়েন্দা হোটেলের বয় সেঙ্গে দিনরাত্তির
সাহেবের কাছে থাকে। সাহেব হোটেলের বাইরে কোথাও যাব না,
কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। তার মানে দোকান
থেকে হীরে হাত সাফাই করে সরিয়ে ধাকলেও সেটা সে বোম্বেতে
কাউকে বিক্রি বা পাচারের চেষ্টা করেনি। বোধ হয় ভারতের
বাইরে নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল দামে উটা বেচার ইচ্ছে তার আছে।

‘বোম্বের পুলিশের ধারণা যে ম্যাজিসিয়ানরা যাকে পাসিং বলে
সেই কৌশলে গিলকি হীরেটি হস্তগত করেছে, তারপর কোথায়
সেটি লুকিয়েছে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। গিলকি বোম্বে
থেকে কলকাতায় এসেছে। এইখানেও কাউকে সে হীরে বেচার
চেষ্টা করেনি। এরোপ্লেন থেকে বাইরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আমরা তার ওপৰ নজৰ রেখেছি। কাল রাত্তিরে সে গ্র্যাণ্ড হোটেলে
ছিল। বোম্বের মতোই সেখানেও এক গোয়েন্দা হোটেল বয় সেঙ্গে
নজৰ রাখে তার কাছে কেউ আসে কিনা। কিন্তু কেউ আসেনি।
এখন সে এরোড়োমে এসেছে, একটু বাদেই ফ্লাই করবে। আমি
টেলিফোনে অফিসারদের বলেছি তোমায় না নিয়ে আসা পর্যন্ত যে
করেই হোক তার ফ্লাইট দেরী করিয়ে দিতে। এরোড়োম অফিসার
তুমি না পৌঁছানো পর্যন্ত রাঙ্গি হয়ে তার প্লেনে তেলভরা দেরী
করিয়ে দিতে বা অন্য প্লেন এখনি ল্যাও করবে তাই গিলকির টেক
অফ একটু দেরিতে হবে ইত্যাদি বলতে রাজী হয়েছে।

‘এখন আমরা এসে পড়েছি। আইনত সাহেবকে আটকাবার
ক্ষমতা আমাদের নেই অথচ আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস তার কাছে
হীরেটা নিশ্চয়ই আছে। মাত্র পনেরো মিনিট তুমি সময় পাচ্ছ,
সমর, ঢাখো যদি হীরেটা উদ্ধার করতে পারো। আমরা হার
মেনেছি। বাট উইস ইউ সাকসেস।’

তুঁজের গাড়ি এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের কাছে এসে থামলো।

ଓৱা দুজনে নেমে পড়লো। ভেতৱে চুকে দেখলো লাউঞ্জের এক সোফায় আৱাম কৱে বসে বৰি গিলকি সিগাৱেট টানছে। মুখ বন্ধ কৱে নাক দিলৈ খোঁয়া ছাড়ছে। তাকে বেশ নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। মনে মনে হয়তো বুঝেছে কলকাতাৰ পুলিশ ও কাস্টমস তাৱ কাছে হাব মেনেছে। আৱ কিছুক্ষণ পৱেই নিৱাপদে সে ভাৱত ভ্যাগ কৱতে পাৱবে।

ভুজঙ্গকে দেখে অন্ত্যান্ত অফিসারৰা তাৱ কাছে এলো। সমৱেৱ
কানে আসে তাদেৱ কথাবাৰ্তা:

—‘আবাৱ আমৱা ওৱ সমষ্ট মালপত্ৰৰ তত্ত্বতন্ত্ৰ সাৰ্চ কৱেছি।’

—‘জামা কাপড় খুলিয়ে বড়ি সাৰ্চ কৱেছি। পায়েৱ জুতো
মোজা পৱৈক্ষা কৱা হয়েছে।’

—‘কোটেৱ লাইনিং, স্টুটকেসেৱ সিক্রেট পকেট ইত্যাদি স্মাগ-
লাবদেৱ যত রকম লুকোবাৱ জায়গা থাকতে পাৱে সবেৱট সন্ধান
কৱেছি। লোকটা একেৱাৱে গঞ্জাজলে ধোয়া তুলসীপাতা।’

— আমাৱ মনে হয় হীৱেটা ও গিলে ফেলেছে। একমাত্ৰ ওৱ
পেটেৱ মধ্যেই থাকা সন্তুব।’

—‘তাহলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে জোলাপ কৈছে
হবে।’

—‘এমনিতেই ও বলা শুৱ কৱেছে তোমৱা আমায় অনৰ্থক
হাবাস কৱেছে। তোমাদেৱ জন্মে ঠিক সময়ে সিঙ্গাপুৱে না পৌছাই
যদি তাহলে আমাৱ ভীষণ ক্ষতি হবে। তখন তোমাদেৱ ক
দিতে হবে। আমি আমেৰিকাৰ কনসালকে জানাৰো, সে বাবা,
হোম ডিপার্টমেন্টকে বলবে এক নিৱীহ বিদেশীকে তোমৱা আলাতন
কৱেছে।’

—‘হই? শেষে আমাদেৱ চোখেৱ সামনে দিয়ে চোৱটা বুক
ফুলিয়ে বেৱিয়ে যাবে। লজ্জাৰ কথা! কাগজে চি চি পড়বে।’

সমৱ ওদেৱ আলোচনা শুনতে শুনতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিত্বে বৰি

গিলকিকে লক্ষ্য করছিল। সাহেব এক নাক দিয়ে স্টৌম-ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

সিগারেট শেষ হয়ে আসতে সেটা থেকে আর একটা ধরাতে ধরাতে অফিসারদের উদ্দেশ্য বললো—‘ফাইভ মিনিটস মোর। আই হোপ এভরিথিং ইজ অলবাইট। আউ ক্যান টেক-অফ এ্যাট দি সিডিউলড টাইম।’

ভুজঙ্গ সমরের দিকে চেরে বললো, ‘ভারতের রন্ধ ভারতে রাখার জন্য আমি একটা লাস্ট চাঙ্গ নেবো। তাতে আমার চাকরি যাঘ যাক।’

সমর হেসে বললো, ‘সে কি! ভবিষ্যতে প্রমোশন পেয়ে তোমায় যে আমি পুলিশ কমিশনার দেখতে চাই। বিগগীর এক টিপ নস্তি জোগাড় কর দেবি।’

কিছু বুঝতে না পেরে ভুজঙ্গ বোকার মতো প্রশ্ন করলো, ‘নস্তি?’

—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরোড়োমের কর্মচারী বা প্যাসেঞ্জার কারও কাছে নস্তি পাও কিনা তাড়াতাড়ি দেখ! নিশ্চয় কারও না কারও ওয়া অভ্যাস আছে। নস্তি পাওয়ার ওপর তোমার চাকরির নির করছে। শিগগীর—’

সমরের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও তার উপর আস্তা ধাকায় ভুজঙ্গ ছুটে চলে যায় নস্তিখোর খুঁজে বের করতে।

সমর এগিয়ে গিয়ে গিলকির সঙ্গে আলাপ শুরু করলো। ইংরাজিতে।

—‘সুপ্রভাত!’

—‘সুপ্রভাত আপনি আবাব কে? ডিটেকটিভ না কাস্টমসের স্লোক?’

—‘ওদের কেউ নয়। একজন সেখক।’

—‘সেখক? সাংবাদিক? দেখুন তো মিছিমিছি সন্দেহ করে আমায় একা কী রকম জালাতন করছে। এ নিয়ে আপনাদের

কাগজে খুব লিখুন। এ রকম বিরক্ত করলে আর কোনো আঘ-সম্মানী বিদেশী এ দেশে বেড়াতে আসবে? আপনারা ফরেন এক্সচেঞ্জ সহজে পাবেন?’

—‘সত্য কথা। নিশ্চয়ই লিখবো। তা আপনি তো এখনি রাখন। হচ্ছেন?’

—‘হ্যাঁ। ওরা আমায় অনেকবার সার্চ করেছে।’

অফিসারদের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে গিলকি বলে, ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাশ্চয় আর একবার সার্চ করুক। তাতেও সম্পূর্ণ না হলে বলুক, আমি না হয় উলঙ্গ হয়েই প্লেনে উঠবো।’

সমর বলল, ‘তার দরকার হবে না। ওরা আর সার্চ করবে না, যাবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার একটু মতামত শুনি।’

—‘ও, জার্নালিজমের জন্য! আপনাদের দেশটা বড়ো গরম লাগে আমাদের কাছে।’ সমরকে একটা সিগারেট অফাৰ করে সাহেব বললো।

—‘গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তো। অনেকের আবার গরমে সর্দিগর্মী হয়। আপনার সে রকম কিছু হয় নি তো?’

—‘না। অবশ্য আমি মাত্র তিন দিন বোম্বে ছিলাম, আর এক দিন কলকাতায়।’

—‘আপনার সর্দি হয় নি তো?’—‘না।’—‘ও।’

ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ এক নস্তির ডিবে এনে সমরের হাতে দিল।

সমর উঠে দাঢ়িয়ে বলল ‘ভুজঙ্গ, সাহেবকে জোর করে নাকে নস্তি দিয়ে দাও। নাকের গর্তে হীরেটা পুরে রেখেছে।’

অফিসাররা সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে ঘিরে ধরে ধ্বন্তাধন্তি করে নস্তি দেওয়ানো হয়। সাহেবের হাঁচির সঙ্গে হীরেটা বের হয়ে আসে। আর সাহেবকে প্লেনের বন্দলে পুলিশের গাড়িতে চাপতে হয়।



লম্বুদার গোয়েন্দাগিরি

পরিচয় গুপ্ত

বামবাম করে বৃষ্টি পড়ছে ।

এই বৃষ্টির মধ্যে একে একে সকলে এসে উপস্থিত হলেও, আড়ার চূড়োমণি লম্বুদা তখনো হাজির হন নি । আমরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলুম, এই দুর্ঘাগে লম্বুদা আজ আর আসছেন না ।

আমাদের অহুমান যখন প্রায় তেরো আনাই সত্ত্ব হতে চলেছে, হঠাৎ বাইরে থেকে শিসে একটি পপুলার ইংরিজী গানের সুর ভেসে এল । লম্বুদা ইংরিজী গান জানতেন বটে, কিন্তু তাকে শিস দিয়ে গান গাইতে কখনো দেখা যায় নি । কিঞ্চিৎ সন্দেহের দোলায় যখন আমরা সকলেই দোহৃল্যমান, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লেডীজ ছাতা মাথায় দিয়ে যিনি এসে দরজায় দাঢ়ানেন তিনি আর কেউ নন আমাদেরই পরম প্রিয় লম্বুদা ।

লম্বুদা ঘরে ঢুকে সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন । তারপর লেডীজ ছাতাটা সন্তর্পণে তাঁজ করতে করতে বললেন, ভাগিয়স্ এই বিলেতী ছাতাটা নিয়ে বেরিয়েছিলুম । বৃষ্টির যা ছাঁট, দিশি ছাতা হলে এতক্ষণ ছাতা ছাতু হয়ে যেত ।

লেডীজ ছাতা দেখে আমাদের পূর্বেই কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল । বিলেতী বলাতে আমরা আরো খুঁটিয়ে ছাতাটা নিরীক্ষণ করতে শুরু করলুম । মামুলি বাঁশের বাঁটেরই ছাতা । কাপড়টা কালো হলেও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে । শিকগুমোও সব নড়বড় করছে । যে কোনো মুহূর্তে বাঁধন কেটে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে ।

‘আমি আর কৌতুক চাপতে পারলুম না । বললুম, লম্বুদা আপনার এই বিলেতী ছাতাটা কিনতে কি রকম খরচ পড়েছিল ?

নামাম্ব-অস্ত্রে লম্বুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। চেয়ারে
বেশ জাঁকিয়ে বসতে বসতে বললেন, কিনব কী হে! কুইন এলিজা-
বেথের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? এটা তাঁরই পার্সোনাল ছাতা। চোর
ধরে দেবার পুরস্কার হিসাবে তিনি এটা আমায় দিয়েছিলেন।
নেহাঁ বৃষ্টির জল লেগে লেগে ক্রাউন ছাপটা মুছে গিয়েছে, তা
নাহলে হাতেনাতে ভজিয়ে দিতে পারতুম। লম্বুদা বেশ গর্বের সঙ্গে
কথাগুচ্ছে উচ্ছুরণ করে, পকেট থেকে একটা কাঁচি সিগারেট বার
করে ধরালেন এবং ঘন ঘন টেনে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

লেডীজ ছাতাটা যে ইতিহাসপুষ্ট সেটা অনুমান করতে আর
আমাদের কারুরই অস্মুবিধি হল না। আজকের এই বৃষ্টি-বাদলার
দিনে আড়াটা বেশ ভালই জ্বরে ভেবে যখন আমরা নড়েচড়ে বসছি
লম্বুদা আড়চোখে সেটা প্রত্যক্ষ করে হঠাঁ বললেন, ঠাণ্ডার দিনে
এক রাউও চা খেলে হয় না?

বৃষ্টিতে ভিজে এসে অনেকেই অস্ফিন্সিবোধ করছিল। লম্বুদা
প্রস্তুব করা মাত্রই, সকলে একবাক্যে বলে উঠল, না-ই-স। লম্বুদা
সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টাকার নোট বার করে
টেবিলের ওপর রেখে বললেন, শুভস্তু শীঘ্ৰম।

সবচেয়ে বেশি ভিজেছিল বাস্তব। লম্বুদা টাকা বার করে
টেবিলের ওপর রাখা মাত্রই সে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে দৌড়ল
চায়ের দোকানের উদ্দেশ্যে।

স্বাদে ও গন্ধে চায়ের তেমন কোনো আকর্ষণ না থাকলেও কেবল-
মাত্র শৱীর গরমের দোহাইতে গরম চা-টা খে ভালই লাগল।
লম্বুদা চোখ বুজিয়ে বেশ তারিফ করেই চায়ের ভাড়ে চুমুক দিতে
লাগলেন। ভাড়ের চা প্রায় নিঃশেষ হচ্ছে এসেছে হঠাঁ বিপ্লব বলল,
আচ্ছা লম্বুদা আপনার পুরস্কার পাওয়ার কাহিনীটা আজ আমাদের
শ্রান্তে কোনো আপত্তি আছে?

আপনি? লম্বুদার চোখ ছুটে চকচক করে উঠল। আপনি কিসের, আমি তো চুরি করে পুরস্কার পাইনি বরং চোর ধরে দেবার জগ্নেই এই পুরস্কার। এ কাহিনী তো আমি বুক ফুলিয়ে বলব বলে—লম্বুদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

লম্বুদা যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের প্রস্তাৱ মেনে নেবেন এটা আমৰা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। চায়ের পাট মিটতে তাই আমি বললুম, লম্বুদা তাহলে শুক করে দিন। শুভ কাজে বিলম্ব না হওয়াই ভাল যখন।

‘ন্যাইট ইউ আর’ বলে লম্বুদা সিগারেটে একটি জোরালো টান দিলেন তারপর টিপে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, ‘স্পোর্টস ওয়াল্ডে’ আমার ইন্টারন্যাশন্যাল রেপুটেশনের কাহিনী তোমৰা ভাল-ভাই জান। নতুন করে আজ আর তা বলাৰ প্ৰয়োজন নেই।

গত বছৰ স্কটল্যাণ্ড গোয়েন্দা বিভাগের মুখ্য অধিকৰ্তা ও আমাৰ ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ডানকান ডেঙ্গু ট্ৰাঙ্কলে আমাৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰে বলল, লম্বমান ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্ৰেলিয়াৰ টেস্ট খেলা দেখবে নাকি? তাহলে সামনেৰ সপ্তাহেই চলে এস। আমি টিকিট সংগ্ৰহ কৰে রেখে দেব।

নানা কাজেৰ চাপে আমি বছদিন বাইৱে বেৰুতে পারিনি। ডানকানেৰ কাছ থেকে নিম্নৰূপ পাবামাত্ৰই হঠাৎ মনে হল, ঘুৱেই আসি। খেলা দেখাও হ'বে, বেড়াও হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাৰ নিম্নৰূপ গ্ৰহণ কৰে জানিয়ে দিলুম, অলৱাহ্ট, আই ডু অ্যাক-সেপ্ট ইওৱ ইনভিটিশান।

স্কটল্যাণ্ড এয়াৱ টার্টে নেমে একটা ট্যাঙ্কী ভাড়া কৰে সোজা চলে গেলুম মিডলটন রোডে, সৱকাৰী ডাক বাঞ্ছোতে।

ডানকান তখন ছেলেকে টুইস্ট নাচ শেখাচ্ছিল। আমি নিচে থেকে কলিং বেল টিপতেই সে জানলা দিয়ে মুখ বাঢ়াল। আমাৰ

পেঁজে চোখাচোরি হত্তেই সে ‘হ্-র-র-র-রে’ বলে চিংকার করতে করতে নেমে এল নিচেতে। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে স্থানেই টুইস্ট নাচতে শুরু করে দিল।

ডানকানের আদরের জালায় আমার প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত, হঠাতে মিসেস ডানকান বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ডানকানকে ধমক দিয়ে বলল, বলি হচ্ছেটা কি? বেচারী হাজার হাজার মাইল পথে পেরিয়ে এল কোথায় একটু বিশ্রাম করতে দেবে তাঁরা—নাচ কি পালিয়ে যাচ্ছে?

বউয়ের কাছ থেকে ধমক খেয়ে ডানকান বেশ একটু দমে গেল। নাচ ধামিয়ে আমাকে বলল, চল তাহলে বিশ্রাম করা যাক।

‘লম্বুদা হঠাতে থেমে গিয়ে মৃত্যু পা নাচাতে শুরু করলেন।

। লম্বুদার এই অপ্রত্যাশিত বিরতি আমাদের কাঁকরই মনঃপূত ছল না। চমক বললে, দোহাই লম্বুদা এভাবে রসঙ্গ করবেন না। ধলুন তারপর কি হল?

লম্বুদা বোধ হয় এইজন্তই অপেক্ষা করছিলেন। চমক অনুরোধ করা মাত্রই মুচকি হেসে বললেন, গরম কফি খেতে খেতে আমরা বিনজনে বসে গল্প করছি হঠাতে বন্ধন করে ফোন বেঞ্জে উঠল। ডোরকান উঠে গিয়ে কোনটা ধরল।

কুইন এলিজাবেথের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস ঝুমঝুমি লিন্টনের ফোন। রাজবাড়িতে কিছু পাউণ্ড চুরি ঘাবার ব্যাপারে, রাণী এখনি চূন্দখা করতে চান তার সঙ্গে। এই চুরির তদন্তের ভার তাকেই নিতে হবে।

স্বয়ং ইংলণ্ডের তলব পেয়ে ডানকান বেশ একটু ঘাবড়ে গিরে ঝঁকঁ ঝঁকঁ করে গিলে ফেঙ্গল গরম কফিটা। তারপর বধারীতি লুপাশাক পরিচ্ছদ চড়িয়ে, আমার সঙ্গে করমদ্দন করে বেরিয়ে তৃণগল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

মিসেস ডেঙ্গু খাস ইংরেজ মহিলা হলেও রান্নাবান্নায় তাঁর ভৌষণ সখ। বই পড়ে পড়ে হেন দেশের রান্না নেই যে তাঁর জানা নেই। আমি যাচ্ছি শুনে আগে থেকেই অঞ্জবিস্তুর সব কিছু সে জোগাড় করে রেখেছিল। আমাকে বশিয়ে রেখে পনেরো মিনিটের মধ্যে এক প্লেট হালুয়া তৈরি করে এনে বললে, থেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে আমি ততক্ষণে সাধের বন্দোবস্ত করি।

মিসেস ডেঙ্গু রান্নাঘরে চলে যেতে আমি আর কি করি, বুক-শেলফ থেকে একখানা ক্রাইম সিরিজের বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে ফিরুম।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা সুরতে সুরতে বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা পেকুতে চলল তখনো ডেঙ্গুর দেখা নেই। আমি চিন্তিত হয়ে উঠলেও মিসেস ডেঙ্গুর মধ্যে কোনোরকম চিন্তা ভাবনা চোখে পড়ল না। বরং আমার ছটফটানি দেখে মিসেস ডেঙ্গু বললে, এত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জীবনে গোয়েন্দাগিরি তো করলেন না, এর মাহাত্ম্য বুঝবেন কি করে?

বিকেলের পর সঙ্গেও প্রায় উৎরোতে যায়, হঠাৎ কলিং-বেল বেজে উঠল। আমি বসে বই পড়ছিলাম। বেল শুনে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই, গুড ইভিনিং বলে ডানকান চুকল চিন্তিত মুখে।

আমি ওর দিকে একটা সিগারেট বাঢ়িয়ে দিয়ে হাসতে বললুম, বড় রকমের কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।

ডেঙ্গু ছ-কাপ কফির ফরমায়েস দিয়ে, হো হো করে হাসতে হাসতে বললে, বড় রকমের চুরি-ডাকাতি ধরাতেই তো স্কটল্যাণ্ড গোয়েন্দা বিভাগের এত নাম। ওতে আমাদের মতো হঁদে গোয়েন্দারা ধাবড়ান্ন নাকি?

এই হিঁচক চুরি ধরাতেই যত গঙ্গোল। তাঁর ওপর রাণীর যা সর্ত, তে করে কি আর চোর ধরা সন্তুষ্ট না?

ডেঙ্গুর কথা শুনে আমি কৌতুহল চাপতে পারলুম না। বললুম,
যদি আপনি না থাকে তো ঘটনাটা শুনতে পারি ?

ইতিমধ্যে মিসেস ডেঙ্গু তু-কাপ কফি এনে হাজির করল।

ডেঙ্গু কফিতে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আর বল কেন,
বুমুমি লিটনের কাছ থেকে ফোন পেয়ে আমি তো সোজা রাজ্ঞ-
প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলুম। বুমুমি আমার জগ্যে অপেক্ষা
করছিল। আমি পৌঁছতে, আমাকে নিয়ে গেল রাণী এলিজাবেথের,
কাছে।

এলিজাবেথ উল বুনছিল। আমাকে রাজকীয় কায়দায় অভ্যর্থনা
জানানোর পর বললেন, কাল আমার বসার ঘরের টেবিলের ওপর
ভ্যানিটি ব্যাগটা ভুলবশত ফেলে এসেছিলুম। ব্যাগের মধ্যে দশ-
হাজার পাউণ্ডের নোট ছিল।

আজ সকালে খুলে দেখি একশো পাউণ্ডের একখানা নোট, ওর
মধ্য থেকে খোয়া গিয়েছে। আমার দাস-দাসীর সংখ্যা পঁচাশত
জনের মতো। এটা যে তাদেরই একজনের কাজ এ বিষয়ে আমি
সুনিশ্চিত। এই সামাজি একশো পাউণ্ড চুরি নিয়ে আমি হৈচৈ
করার পক্ষপাতী নই। তাতে আমারই বরং স্বনাম ক্ষুণ্ণ হবে।
অথচ এই ছিঁকে চোরটি কে আমার জানার খুব ইচ্ছে। আর
সেই জগ্যেই পুলিশের শরণাপন্ন না হয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ
করেছি।

কোনো রকম হৈচৈ না করে এমন কি আমার দাস-দাসীদেরও
অজ্ঞাতস্বারে আমাকে চোরটি কে দেখিয়ে দিতে হবে। কেবলমাত্র
তার শ্রীমুখ দর্শন করা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।
এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছে তদন্ত কাজ পরিচালনা করুন।

এলিজাবেথের আবদার শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ !
কাক-পক্ষী টের পাবে না—চোর সেজেই চোরকে ধরতে হবে
তা হলে

যা হোক, আর সময় নষ্ট করা সর্বীচীন বলে মনে করলুম না।
প্রাথমিক তদন্তের কাজ শুরু করে দিলুম।

বসার ঘরের মেঝে পরীক্ষা করে দেখলুম কোনো পায়ের ছাপ-
টাপ আছে কিনা। চোরের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রও যদি কিছু
পড়ে থাকে। না—তাও পড়ল না। অগত্যা ভ্যানিটি ব্যাগটা
সম্পর্ণে কাগজে মুড়ে নিয়ে রওনা হলুম আমাদের ফরেনসিক
ল্যাবরেটোরীর উদ্দেশ্যে।

নানাভাবেই ব্যাগটাকে পরীক্ষা করা হল। যদি হাতের বা
আঙুলের কোনো ছাপটাপ মেলে। কিছুট নেই। অর্থাৎ ব্যাগটির
মুখ যে খোলা অবস্থাতেই ছিল এবং তার মধ্যে ধেকেই ছই
আঙুলের সাহায্যে নোট বার করে নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে আর
বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

যে নম্বরের নোটটা চুরি গিয়েছিল, ভাবলুম পুলিশকে একবার
সেটা জানিয়ে দিই। কিন্তু পর মৃত্যুতেই মনে হল একশো পাউণ্ডের
একখানা নোট বাজার থেকে ধরা কি আর মুখের কথা? এতক্ষণে
সেটা হাতবদল হয়ে গিয়েছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

আমাদের গোয়েন্দা শাস্ত্রে চোর পাকড়াবার আরও যে সব
কসা-কৌশল আছে এ ক্ষেত্রে কোনোটাই প্রযোজ্য নয়। কারণ
তাতে একটু না একটু হৈচৈ হবেই।

বেশ হতাশ হয়েই রাজপ্রাসাদে ফিরে এলুম :

এলিঙ্গাবেথ আমার মধ্যে হতাশার আভাস পেয়ে, চুপিচুপি
আমার কানে কানে বললে, মিঃ ডেন্ড্রু আপনি শুধু স্কটল্যাণ্ডের নম্ব
বিশের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাও বটে। আর সেইজন্তেই আপনার শরণাপন্ন
হওয়া। আপনার কোনো অজুহাতই শুনব না। যেভাবেই হোক,
আপনাকে চোরকে ধরে দিতে হবেই।

কুইনকে এভাবে নাছোড়বান্দা হতে দেখে আমি কি করি, তিনি

‘দিন সময় চেষ্টে নিলুম। কথা দিলুম, এই তিন দিনের মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত করবই।

কুইন হেসে বলল, আপনি যে একজন জাত গোয়েন্দা আপনার অবাবই তার সাক্ষী।

মিসেস ডেঙ্গু এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ডেঙ্গুর কথা বলা শেষ হওয়া মাত্রই তাকে গা-হাত-পা ধূঘে কিছু ধাবার কথা শ্বরণ করিয়ে দিল।

ডেঙ্গু তাতে বেশ একটু লজ্জিত হয়েই উঠে গেল সেখান থেকে।

আমি টেবিল থেকে বইটা টেনে নিয়ে আবার তাতে মনোনিবেশ করলুম।

পরের দিন ভোর থেকে আর ডেঙ্গুর পাস্তা নেই। সারাটা দিন টাই টাই করে ইংল্যাণ্ড স্টেল্যাণ্ড চেষ্টে ফেলে, রাতে ধাবার টেবিলে বসে বললে, লাম্বু ইটস্ এ গ্রেট চ্যালেঞ্জ। যে ভাবেই হোক রাঙ্গ-বাড়ির এই সখের চোরকে আমায় ধরে দিতেই হবে। না হলে চাকুরিতে ইস্ফা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ধাকবে না।

আমি সাহস জোগাই। ভরসা দিই। শেষে বলি, ডোক্ট গেট নার্ভাস মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, গো-অন্ত!

ঢু-দিন খুব উৎসাহভরে দৌড়োদৌড়ি করলেও, তৃতীয় দিন ছপুর বেলা ডেঙ্গু দৌর্ঘ্যাস কেলে বললে, কোয়াইট ইমপসিবল। কুইনের ঐ সর্তে চোর ধরা আমি তো কোন ছার আমার বাবা এলেও পারবে কিমা সন্দেহ। তারপর আমার উদ্দেশ্যে বললে, তুমি তো নিজেকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বলে জাহির কর, এ ব্যাপারে একটু কেরামতি দেখাও তবে তো বুঝি!

আমি হেসে উন্তর দিলুম, ইয়ার্কি করছ না সীরিয়াস্সি বলছ?

ডেঙ্গু চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললে, থর সীরিয়াস্সি।

আমি বললুম, বেশ। আমি চেষ্টা করে দেখছি। তুমি কেবল আমার একটা গাড়ি বন্দোবস্ত করে দাও আর রাণীর কাছে আমার একটা পরিচয়-পত্র লিখে দাও।

ডেঙ্গু মজা দেখবার জন্যই উৎসাহভরেই সব বন্দোবস্ত করে দিল। আমি গাড়ি করে স্টেল্যাণ্ড চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলুম।

লম্বুদা পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে পরম নিশ্চিন্তে টেবিলের ওপর টোকা দিয়ে মশলা বসাতে শুরু করলেন।

টোকা পর্ব শেষ হতে লম্বুদা সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁসা ছাড়তে ছাড়তে বললেন, চিড়িয়াখানা থেকে গেলুম রাজবাড়িতে। এলিঙ্গা-বেথের কানে ফিসফিস করে গুটিকতক নির্দেশ দিয়ে বললুম, আপনি ব্যবস্থা করুন। দেখুন চোর এসে আপনিই ধরা দেবে।

কুইন খুশি হয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। চোর ধরা পড়লে আমি মিঃ ডানকান ডেঙ্গুর ঠিকানায় আপনাকে যথাসময়েই জানাব।

রাজবাড়ি থেকে আমি গাড়িতে চলে গেলুম মার্কেটিংএ। মার্কেটিং সেরে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে।

ডেঙ্গু ঘরের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পায়চারি করছিল। খুশি খুশি মেজাজে আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, কী, রহস্য সমাধানের কতদুর অগ্রগতি হল?

আমাকে আর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেলে উঠল। ফোনে কুইন বললেন, মিঃ ডানকান, আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। আপনার দি প্রেট ফ্রেণ্টকে নিয়ে অখুনি চলে আস্বন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাব।

স্বয়ং রাণীর অমুরোধ। এড়িয়ে যাবারও কোনো পথ নেই। অনিচ্ছা সন্ত্বেও ডেঙ্গু আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে।

ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ନିଜେଇ ଆମାଦେର ଖାଓସା ଦାଓସାର ତନ୍ଦାରକ କରଲେନ । ସବ ଶେଷେ ଆମାର ହାତେ ଏକଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ ଦିଯେ ବଲଲେନ, ଆପନି ଯଥନ ପ୍ରଫେଶନାଲ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନନ, ଆପନାର ଏକଟା ରିଓସାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ୟ । ସା ଉପ୍‌ୟୁକ୍ତ ଭାବେନ ଆପନି ଚେକେ ବସିଯେ ନିନ ।

ଆମି ବଲଲୁମ, ଏକ୍‌କିଉଙ୍ଗ ମି । ଟାକାର ଲୋଭେ ଏ କାଜ ଆମି କରି ନି । ତବେ ଆପନି ଯଦି ଏକାନ୍ତରୁ ଇଚ୍ଛେ କରେନ ଶୁତି-ଉପହାର ହିସେବେ କିଛୁ ଦିତେ ପାରେନ ।

ଆମାର ପ୍ରତ୍ଯାବର୍ତ୍ତ ଶୁନେ ଏଲିଜାବେଥ ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ଛାତାଟା ଟେନେ ନିର୍ମେ ବଲଲେନ, ଆମେରିକାର ସ୍ଵର୍ଗତ ପ୍ରେସିଡେଟ୍ କେନେଡି ସାହେବ ଆମାର ଜନ୍ମଦିନେ ଏଟା ଆମାର ଉପହାର ଦିଯେଦିଲେନ ।

ଆପନାକେ ଆମି ଏଟାଇ ଉପହାର ଦିଲୁମ । ତବେ ଲେଡୀଜ ଛାତା ବଲେ କିଛୁ ମନେ କବେନ ନା । ଲେଡୀର କାହିଁ ଥେକେ ଲେଡୀଜ ଜିନିସ ଉପହାର ପାଓସାଇ ତୋ ସ୍ବାଭାବିକ ।

ଲୟୁଦା ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୟେ ମୁଚକି ମୁଚକି ହାସତେ ଲାଗଲେନ ।

ଛାତାର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶୁନେ ଯଥନ ଆମରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୋଖ କରେ ଲୟୁଦାର ମୂଢ଼େର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛି, ହଠାତ୍ ବାନ୍ତବ ସରବ ହୟେ ଉଠିଲ । ବଳେ, ଆପନାର ଲେଡୀଜ ଛାତା ଆଣ୍ଟିବ କାହିଁମୀ ତୋ ଶୁନଲୁମ, କିନ୍ତୁ କି ଭାବେ ଆପନି ଡାନକାନକେ ଟେକା ମେରେ ଚୋରଟାକେ ପାକଡ଼ାଓ କରଲେନ ନେଟା କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ବୋଧଗମ୍ୟ ହଲ ନା ।

ଲୟୁଦା ବାନ୍ତବେର ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ଶୁନେ ପର ପର କୟେକବାର ସିଗାରେଟେ ଜୋର ଜୋର ଟାନ ମେରେ ଧୋସା ଛାଡ଼ିତେ ଛାଡ଼ିତେ ବଲଲେନ, ଚିଡ଼ିଯାଧାନା ଗିଯେଛିଲାମ ଆଗେଇ ବଲେଛି । ମେଥାନ ଥେକେ ଏକଟା ଆକ୍ରିକାନ କୁକଡା ବିହେ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଆମି ମୋଜା ଚଲେ ଗେଲୁମ ରାଜ୍ବବାଡ଼ିତେ । କୁଇନକେ ଆମାର ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖିଯେ କାନେ କାନେ ବଲଲୁମ, ଯେ ସରେ ଯେ ଟେବିଲେର ଓପର ଥେକେ ଆପନାର ନୋଟ ଚୁରି ଗିଯେଛିଲ, ସେଇ ସରେ ସେଇ ଟେବିଲେର ଓପରେଇ, ଆପନି ଏବଂ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗଟା ନୋଟ ଭର୍ତ୍ତ କରେ

তার মধ্যে এই কাকড়া বিছেটা ছেড়ে রেখে দিন। এবং নিজেৎ
আড়ালে থাকুন, দেখবেন চোর নিজেকেই নিজে ধরিয়ে দেবে।

কারণ চোরের ধর্মই হল যেখান থেকে সে চুরি করে তার আশে
পাশে ঘুরে বেড়ান। এ ক্ষেত্রেও নোটভর্তি ভ্যানিটি ব্যাগটা ওখাতে
আবার পড়ে থাকতে দেখলে লোভ সামলাতে না পেরে আবার যে
ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাবে। আর হাত ঢোকাসহেই কাকড়া বিয়ে
তার কর্তব্য সম্পাদন করবে।

কুইন আমার নির্দেশ মতোই কাজ করেছিলেন এবং ফলঃ
পেয়েছিলেন বলে সম্মুদ্দা হো হো করে হাসতে লাগলেন।

সম্মুদ্দার অভিনব কৌশল শুনে যখন আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া
চাওয়ি করছি, সম্মুদ্দা হঠাত আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঢ়ালেন এবং
নিউ মার্কেট থেকে কলা কেনার ছুতো ধরে গটগট করে বেরিয়ে
গেলেন ঘর থেকে।

আমরা সাধু সাধু বলে চিৎকার করে উঠলাম।

